পিঞ্জরে বসিয়া নহে

বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শেষের রাত্রি অথবা রাত্রি শেষের গল্প

ক্লোজিং অফ এ স্কুল মীনস

ওপেনিং অফ এ প্রিজন

আজ সকালে মহান্তি সাহেব সপরিবারে চলে গেলেন।

ফুল পাঞ্জাব লরি ছাড়াও, একটি ম্যাটাডোর ভাড়া করতে হয়েছে। স্বচ্ছল পরিবারের বিশ বছরের সঞ্চিত জিনিসপত্র। শুধু বই-ই দু ট্রাঙ্ক ভর্তি। গতকাল সন্ধ্যায় মহান্তি এসেছিলেন শেখরের বাড়িতে। শেখর অবাক হয়েছিল, আপনি? আসুন, আসুন।

সোফায় বসে মহান্তি হঠাৎই একটু হাসলেন, শেখরের দৃষ্টি এড়াল না, মহান্তির হাসিতে বিষণ্ণতার ছায়া।

— এই বইগুলো রাখুন। খবরের কাগজে মোড়ানো ওয়ান এইট ডিমাই সাইজের পাঁচখানি বইয়ের বাণ্ডিলটি শেখরের হাতে তুলে দিলেন মহান্তি, কোথায় থাকব, কীভাবে থাকব, কিছুই জানি না। আপনি টিচার মানুষ। যেখানেই থাকুন না কেন, বইগুলো সযত্নে আগলে রাখবেন, এটা আমার বিশ্বাস।

মহান্তির কথাগুলি কান্নাভেজা স্যাঁতসেঁতে শোনাল শেখরের কানে। ছোঁয়াচে অ্যালার্জির মতো শেখরেরও গলা ধরে আসছিল কথা বলতে গিয়ে, আপনার মতো আমারও তো অনিশ্চিত ভবিষ্যত। আমিও কি জানি ......!

— তাহলেও! শেখরের অসম্পূর্ণ কথার মাঝেই কথা বললেন মহান্তি, বিশ্বকর্মার হাতুড়ি। সরস্বতীর বই। একটু থেমে বললেন, ল্যাটিন আমেরিকান লেখকদের গল্প, প্রবন্ধের সংকলন। পাঁচটা ভল্যুম কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম কয়েকমাস আগে। পল দুগার 'অ্যান্টি ইমপ্রিয়ালিজম'-র ওপর লেখা প্রবন্ধটা পড়ে দেখবেন, অদ্ভুত রকম মিল, আমাদের এখানকার অবস্থার সঙ্গে। মহান্তি এবার শব্দ করে হাসলেন, অথচ আমাদের অনেক শিক্ষিত মানুষও সেটা ধরতে পারলেন না, এখনও পারছেন না। ভাবছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে একটু এদিক ওদিক হবে। কিছুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মহান্তির কথার মধ্যে তীব্র শ্লেষ বিদ্রূপ মিশে ছিল। শেখরকে তা বিঁধল। সে অস্ফুটে বলল, না, মানে ......!

— বললাম তো। বলে মহান্তি উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক বেঠিক গুলিয়ে দেবার অদ্ভুত খেলা শুরু হয়েছে। দরজার কাছে গিয়ে মহান্তি ঘুরে দাঁড়ালেন। জামার বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে শেখরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, এটা আমার দেশের বাড়ির

ঠিকানা। আপনার চিঠি পেলে খুব খুশি হব মাস্টারমশাই। একটু চুপ করে থেকে মাথা নামিয়ে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, অবশ্য জানি না, বিশ বছর পরে দেশের বাড়িতে আত্মীয়রা এন্ট্রি দেবে কিনা! হয়ত পাণ্ডেজির মতো ভাই ভাইপোর জেলাসিতে টিকতে না পেরে, অন্য কোথাও ছুটতে হবে!

মাস চারেক আগেও ফার্টিলাইজার সিটির কোন বাসিন্দাই ভাবতে পারেনি, অবস্থাটা এত দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে। উৎপাদন হ্রাস, মন্দা বাজার, এসব নিয়ে তিন চার বছর ধরে সরকার এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। বোনাস বন্ধ হযে গেছে ২০০১-এ। যাবতীয় ইনসেনটিভ বাতিল হয়ে গেছে। এসবের বিরুদ্ধে মিছিল, গেট মিটিং, অবস্থান, ধর্ণা, এমনকি গত বছরের শেষের দিকে টানা সাতদিন ধর্মঘটও হয়েছে। লাল গেরুয়া সবুজ সব রংয়ের ইউনিয়ন নেতারা একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেছেন। একসুরে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার, দেশের অন্যতম বৃহত্তম এবং প্রাচীন এই সার কারখানাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, বি. আই. এফ. আর.-এ পাঠাবে। যতদিন না সেখান থেকে কোন উত্তর আসে, ভয়ের কোন কারণ নেই। ববং এটাই হবে, বি. আই. এফ. আর. কিছু প্রপোজাল দেবে, যার নিরিখে কারখানার রুগ্নতার কারণগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইউনিয়ন নেতাদের এইসব কথাবার্তা সকলেই বিশ্বাস করেছে। তারপরেও দুচারজন সন্দিগ্ধ মানুষ শেখরকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনার কী মনে হয় মাস্টারমশাই? সত্যি সত্যি কারখানাটা বন্ধ হয়ে যাবে? আমরা তখন করব কী? যাব কোথায়?

— অবস্থাটা সুবিধের নয় ঠিকই। জবাবে শেখর বলেছে, তবে অতটা ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমাদের সবাইকে যদি চলে যেতে হয়, তাহলে শহরটা তো শ্মশান হয়ে যাবে। দেশের মানচিত্র থেকে এত বড় একটা জনপদ হারিয়ে যাবে।

যারা প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষায় উদগ্রীব চোখে শেখরের মুখের পানে চেয়ে থেকেছে, তাদের চোখমুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে, ঠিক। ঠিক। মাস্টারজী সাচ কথা বলেছেন। সরকারী কারখানায় তালা ঝোলানো কি এত সোজা? এত এত মানুষ বেকার হয়ে যাবে, তাদের ফ্যামিলির লোকজন না খেয়ে মরবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে, তা কখনো হয় নাকি? কাবখানার অবস্থা খারাপ মানছি। বোনাস নেই। ইনসেনটিভ নেই। এরপরে হয়ত ছুটি কমিয়ে দেবে। রিটায়ারমেন্টের বয়স কমিয়ে দেবে। এসব করতে পারে। তো করবে। তা বলে একবারে বন্ধ হয়ে যাবে, ইয়ে কভী নেহি হোগা। ইমপসিবল।

শেখর চিন্তাশীল মানুষ। পেশায় শিক্ষক। ম্যানেজমেন্ট লেভেল থেকে ঠিকা অস্থায়ী কর্মী, সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তার আলাপ মেলামেশা। কোম্পানীর স্কুলে শিক্ষকতা এবং প্রাইভেট টিউশনের দৌলতে উঁচু নীচু মাঝারি সব ধরণের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়। ইংলিশ টীচাব বা আংরেজী মাস্টারজী হিসাবে এক ডাকে সবাই তাকে চেনে।

শেখরের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ভাল। পড়ায়ও ভাল। সর্বোপরি তার সুন্দর মার্জিত ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অগাধ পড়াশুনার সুবাদে, যে কোন সমস্যায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা তার কাছে ছুটে আসেন। মতামত চান। শেখরের যুক্তিতে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। তার আশ্বাসে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। মাস্টারজী যখন বলে দিয়েছেন, ভয় পাওয়ার তেমন কোন কারণ নেই, তখন চোখের সানে একটি সজীব গাছের পাতা একটি একটি করে খসে পড়ে যাচ্ছে দেখেও, প্রত্যেকেই বুকের কোণে এক টুকরো আশা জিইয়ে রেখেছে, গাছটা কখনোই শুকিয়ে মরে যাবে না। বাজারের চাহিদা অনুসারে কারখানার অবস্থার একটু টালমাটাল চলছে। এটা সাময়িক। কারখানা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

যে কোন সমস্যার উপরিতল দেখে শেখর কখনোই কোন সিদ্ধান্তে আসে না। সমস্যার শিকড়ে গিয়ে রোগ এবং তার নিরাময়ের কারণ খোঁজে। পূর্ব ভারতের এই রাজ্যটিতে কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের বড় শরিকের তেমন কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। কিছু কর্মী সমর্থক আছে। স্বীকৃত একটি ইউনিয়নও আছে কারখানায়। লাল সবুজের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে সেই ইউনিয়নটির সমর্থকেবাও কারখানা বন্ধের বিরোধীতা করে। মিছিল, ধর্মঘট, ধর্ণায় অংশ নেয়। এইসব দেখেশুনে শেখরের ধারণা জন্মেছিল, আসন্ন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় শাসকদল, কারখানা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত কখনোই নিতে পারে না। তাতে তাদের দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এমনকি কয়েক মাস পরে পাশের রাজ্যের নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। একে একে হাত পা পেট কোমর সব দুর্বল কমজোরী হয়ে পড়লে, শুধুমাত্র মাথাটুকু ঠিক রেখে তো আর একটা গোটা শরীর সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে না। তার ওপর কেন্দ্রের কোয়ালিশন সরকারের একটি শরিক দলের মাতৃভূমি পিতৃভূমি পূর্ব ভারতের এই রাজ্যটি। শরিক দলটিব নেতৃস্থানীয় কয়েকজন, কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রভাবশালী মন্ত্রী। তারাই বা চাইবে কেন, জোট সরকারের বড়দার মাতব্বরিতে তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে যাক!

শেখরের বাড়িতে মানুষ বলতে দুজন। সে আর তার স্ত্রী। মেয়ে মাস্টার ডিগ্রী করছে। পাটনার হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। ছেলে এ বছরে বারো ক্লাস ফাইনাল দেবে। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে। গ্রীষ্মের এবং পুজোর ছুটিতে ছেলেমেয়ে দুজনেই বাড়ি আসে। তখন বাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ের বন্ধুবান্ধবীরা দেখা করতে আসে। এর ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন হয় সপরিবারে। শেখরের স্ত্রী ছবিও ছেলেমেয়ের বন্ধুদের সকলকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। রীতিমত ভোজবাড়ির মতো চেহারা হয় সেদিন। গত বছরেও দ্বাদশীর দিন দুপুরবেলা শেখরের বাড়িতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেদিনই প্রথম শেখরের চোখে একটা অদ্ভুত গরমিল

ধরা পড়েছিল। এতদিন তার ধারণা ছিল, তার ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই মানসিক গঠন হুবহু তার মতো। অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যের নিরিখে সে যেমন কোন মানুষকে বিচার করে না, ছোট বড় উঁচু নিচু ভাবে না, তার ছেলেমেয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেও ব্যাপারটা একইরকম। শেখরের ভুল ভেঙ্গে গেছিল। মনে মনে আহত হয়েছিল। রাতের বেলায় ছাদে মাদুর বিছিয়ে বসে গল্প করার ফাঁকে সে তার মেয়ে অনুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দেওধর সিংয়ের ছেলে বুধুয়া কি না খেয়ে চলে গেছে?

অনু ঠোঁট উল্টে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন ব্যাপারটা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না বা জানলেও মাথা ঘামানোর মতো সময় বা ইচ্ছে কোনটাই তার নেই। সোজা হয়ে বসে এবার শেখর তার ছেলের মুখের দিকে তাকাল, বাপটু, তোর নজরেও আসেনি?

— বোধহয় খেয়েছিল। দেওয়ালে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। আমার দিকে চেয়ে একবার হাসলও। তারপর আদারওয়াইজ আমি এনগেজড হয়ে পড়েছিলাম।

— হুম। সিগারেটে অল্প একটু টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শেখর, নিমন্ত্রিতদের দেখভালের দায়িত্বটা কার? যে নেমন্তন্ন করেছে, নাকি যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে?

— তুমি বাপি অহেতুক ইমোশনাল হয়ে পড়ছ। অনুর গলায় আদুরে সুর, বুধুয়াকে আমি বা ভাই কেউই তেমনভাবে চিনি না। ও তো আমাদের সিটির ছেলে নয়। রেললাইনের ওপাশে কোথায় থাকে তাও জানি না। আচ্ছা বাপি! গলার সুর পাল্টে অনু জিজ্ঞেস করল, ওর বাবা কি কনট্র্যাক্ট লেবার?

— চুপ। একদম কথা বলবে না। শেখরের মাথায় রক্ত চলকে উঠল, বুঝতে পেরেছি, তোমরা ডিফারেনসিয়েট করতে শিখে গেছ। কার বাবা পারমানেন্ট চাকুরে, কনট্র্যাক্ট লেবারের ছেলে কে! ছিঃ! ছিঃ!

'ছিঃ' শব্দটা শেখর দুবার উচ্চারণ করল। বেশ জোরে। তার বলার মধ্যে এতটাই ঘেন্না মিশে ছিল যে ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা তিনজনেই চমকে উঠল। হালকা পরিবেশটা মুহূর্তে কেমন ভারী অর্থবহ হয়ে উঠল।

রাতে বিছানায় তৈরী করতে এসে ছবি বলল, ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। সামান্য ব্যাপারে ওদের এইভাবে ধমকানো ঠিক নয়। আর ওই ছেলেটা, বুধুয়া না কি যেন নাম, ওর-ই বা না খেয়ে চলে যাবার কি আছে? ওকে কি কেউ দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে? ওতো তোমাকে বলে যেতে পারত। অনু বা বাপটুর কি দোষ বলো? ছোটবেলা থেকে ওরা তো ছেলেটাকে সিটিতে দেখেনি।

— আঃ! চুপ কর তো! শেখর বিরক্তির সঙ্গে বলল, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও। চোখে হাত চাপা দিয়ে শেখর শুয়ে রইল এবং সংবেদনশীল কোন মানুষ অকারণে হেরে গেলে যেমনটি করে, নিজেকে স্বস্তি দেবার জন্য আরামদায়ক অন্য কোন একটি ঘটনাকে

নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে, সেও তেমনইটি করল।

এই তো মাত্র আট মাস আগের কথা। অনু হস্টেল থেকে বাড়ি ফিরবে বলে চিঠি দিয়েছিল। সেইমত শেখর রেল স্টেশনে পৌছে গিয়েছিল। ট্রেন আসার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে। মফস্বল শহরের রেল স্টেশন যেমন হয়, লোকজন কম। তার ওপর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার কারণে সন্ধ্যা না হতেই স্টেশন চত্বরের সব দোকানপাট বন্ধ। খানকয়েক গুমটি খোলা। সেগুলিতে মরা মাছের চোখের মতো ঝাপসা নিষ্প্রভ বাল্ব জ্বলছে। আপ প্লাটফর্মে নিমগাছের নিচে পুরনো টায়ার জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে তাপ পোয়াচ্ছে কয়েকজন কুলী মজুর রিক্সা আর টাঙ্গাওলা। টিকিট কাউন্টারের পিছনপানে আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় বসে চোলাই মদ আর গাঁজা বিক্রি করছে মাঝবয়সী একজন মেয়েমানুষ। শেখর পায়চারি করছিল। হঠাৎ মহিলা গলার চীৎকারে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, মদবিক্রেতা মহিলাটি মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী একটি ছেলের জামার কলার ধরে টানছে। মহিলাটির গায়ের চাদর খসে পড়েছে। বোতামহীন ব্লাউজ হাঁ হয়ে বিশাল আকৃতির দুটি বুক দেখা যাচ্ছে। চোখ ঠিকরে আগুন বেরুচ্ছে। মহিলাটি ছেলেটির গায়ে থুঃ থুঃ করে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে আর চীৎকার করছে, শালে রেণ্ডি কা বাচ্ছে। জুলুম কর রহা হ্যায়? এক পুরিয়া লে তো তেরা গাঁড়মে ডাণ্ডা ঘুঁসা দুঙ্গা।

ঘটনার আকস্মিকতায় শেখর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অপলক তাকিয়েছিল যুযুধান দুজন নারী পুরুষের দিকে। কে যেন পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল, মাস্টারজী, ওসব খারাপ ব্যাপার আছে। এদিকে চলে আসুন। শেখর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দেওধর সিং মিনতিভরা চোখে তার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলছে, চলে আসুন মাস্টারজী। ও জেনানা আউর লেড়কা দোনো খতরনক আছে।

দেওধর সিংয়ের কথামত শেখর যদি সেদিন সেই মুহূর্তে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে না আসত, অবধারিতভাবে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ত। এমনকি তার মৃত্যুও হতে পারত। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে শেখর বোমা ফাটার শব্দ শুনল। তিনবার চারবার। তার সঙ্গে উত্তেজিত কিছু মানুষের চীৎকার আর সব ছাপিয়ে মহিলাটির লাগামছাড়া কান্না, ও শালে ডাকু চুতিয়া কা বাচ্ছে সব কুছ লুঠ লেকর গয়ে থে। হাবিলদার সাব দেখিয়ে ম্যায়নে নাঙ্গা কর দিয়া।

স্টেশন মাস্টারের ঘরের বন্ধ দরজা ধাকাচ্ছে দেহাতী এক বৃদ্ধ আর কাঁদছে, দরওয়াজা খোলিয়ে মাস্টারজী। নেহী তো সাফা হো জায়েগা।

স্টেশন এলাকা থেকে বেশ খানিকটা দূরে শেখরকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে এল দেওধর সিং। পলিথিনের পর্দা ঢাকা একটি রিকসায় শেখরকে ঠেলে তুলে দিল, চুপ করে বসে থাকুন মাস্টারজী। আমি আছি। এ রিকসা আমার ভায়ের আছে।

সে রাতে অনুর ট্রেন এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের তিন ঘণ্টা পরে। এই দীর্ঘ সময় শেখর রিকসার ঘেরাটোপের মধ্যে বসেছিল। এর মধ্যে দেওধর সিং শেখরকে গরম চা খাইয়েছিল। গাছের মূল জাতীয় দেখতে ছোট একটি টুকরো শেখরের হাতে দিয়ে বলেছিল, মুখের মধ্যে রাখুন। জারুস কম লাগবে। নহী তো জারু লেগে সর্দি হবে। খাঁশি হবে।

হাড় হিমকরা ঠাণ্ডা নিশুতি রাতে নিজে রিকসা চালিয়ে শেখর আর অনুকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়েছিল দেওধর। শেখর বারবার বলা সত্ত্বেও এক পয়সা ভাড়া নেয়নি। বরং সংকুচিত ভঙ্গিতে লজ্জিত গলায় বলেছিল, আপনাদের বহুত পরিশান হোল মাস্টারজী। আমার ভাই হলে আরও জোরে গাড়ি টানতে পারত। আমার তো প্র্যাকটিশ নেই। লেকিন নিশা করে ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

রিকসায় আসতে আসতে শেখর অনুকে দেওধরের গল্প করেছিল। দেওধর না থাকলে, স্টেশনের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে তার মৃত্যুও হতে পারত, এটা শুনে অনু চমকে উঠে শেখরের কানে কানে বলেছিল, বিপদেই মানুষকে চেনা যায়, বলো বাপি! শিক্ষিত ভদ্রলোক হলে দেখতে, পাশ কাটিয়ে যেত।

শেখর কোন জবাব দিতে পারেনি। আবেগে তার গলা বুজে আসছিল। দেওধরকে উদ্দেশ্য করে অনু বলেছিল, তোমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে?

— জী দিদিমণি। আট ক্লাসে পড়ে আমার ছেলে। মেয়ে ছোট আছে।

— তোমার ছেলে কি বাপির স্কুলে পড়ে? বাপি, তুমি চেনো?

শেখর ঘাড় নেড়েছিল, আমি তো এইটের ক্লাস নিই না। তবে মুখ দেখলে চিনতে পারব।

— জরুর চিনবেন মাস্টারজী। পড়াই লিখাই খুব ভাল করে। ফেল করে না। একটু কমজোরী আছে। সব কুছুতে ডর পায়। শরম ভী পায়।

তিন দিন পরে রবিবার সকালে দেওধরের ছেলে পুরনো ধুতির ছেঁড়া কাপড়ে জড়িয়ে শুকনো মতো দেখতে দুআড়াই ইঞ্চি লম্বা সরু সরু কয়েকটি ডাল নিয়ে এসেছিল। ডালগুলি দেখেই শেখর চিনতে পেরেছিল। মা মেয়ের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও শেখর আগ্রহ ভরে কাপড়ের মোড়কটি নিয়ে, ছেলেটিকে পড়ার ঘরে বসিয়েছিল। ছেলেটিকে অনেকক্ষণ দেখেও, শেখর খেয়াল করতে পারল না, স্কুলে কোনদিন একে দেখেছে কিনা! তার মানে, দেওধর যে বলেছিল, ছেলেটি লাজুক, ভিতু প্রকৃতির, মিথ্যে বলেনি। যে কোন স্কুলে যে সমস্ত ছেলেরা ভোকাল এবং ডায়নামিক, সব মাস্টারমশাইরা তাদের চেনে। সে যে ক্লাসেরই ছাত্র হোক না কেন। আর চেনে পড়াশুনায় ব্যতিক্রমী ভাল যে সব ছাত্র, তাদের। দেওধরের ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে না। খুব ভালরকম কিছু রেজাল্ট করে, তাও নয়। ফেল না করাটাই দেওধরের কাছে, 'পড়াই লিখাই খুব ভাল করে।'

ছেলেটির নাম সীতারাম। ডাক নাম বুধুয়া। শেখর কথা বলে জানতে পারল, বুধুয়ার

কোন প্রাইভেট টিউটর নেই। তার বাবা বলেছে, এ বছর পাশ করলে, তাকে একজন ইংরাজী মাস্টারমশায়ের কোচিনে ভর্তি করিয়ে দেবে। অঙ্কের একজন প্রাইভেট টিউটর হলেও ভাল হয়। কিন্তু বুধুয়ার বাবা ঠিকা শ্রমিক। প্রতিদিন কাজ পায় না। আবার কোন কোন কাজের দিন অর্ধেক কাজ করিয়ে, কন্ট্রাকটর দেওধরকে বসিয়ে অন্য ঠিকা শ্রমিককে দিয়ে বাকি কাজটুকু করায় এবং এই বদলী শ্রমিকটিকে অপেক্ষাকৃত কম পেমেন্ট করে। শেখর খুব অবাক হয়েছিল। কারণ কন্ট্রাকটরদের এই ছলচাতুরির ব্যাপারটা সে জানত না। ক্লাস এইটের একজন ছাত্রের কাছ থেকে শোষণের নতুন একটি রূপ সম্পর্কে তাকে জানতে হল! হয়ত বুধুয়া তার বাবার মুখ থেকে এসব শুনেছে। বুধুয়া লাজুক ভীতু প্রকৃতির হলেও, এ ধরণের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার যে রাগ এবং ঘৃণা আছে, এটা শেখর বুঝতে পারল, বুধুয়ার চোখমুখের অভিব্যক্তি থেকে। বুধুয়ার বুকের ভেতরে আগুন আছে। ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ আছে। শেখরের তেমনটাই মনে হল। আর এসবের জন্যই বুধুয়ার আত্মসম্মান বোধ আছে। আর আছে বলেই, নিমন্ত্রণ বাড়িতে অন্য নিমন্ত্রিতদের যেভাবে আপ্যায়ন করা হচ্ছে, তাকে সেভাবে কেউ আমল দিচ্ছে না, এটা বুঝতে পেরেই, না খেয়ে নিঃশব্দে চলে গেছে। পেশীর আস্ফালনে বা গলার জোরে সবাই ন্যায্য অধিকার, ঠিক বেঠিকের প্রতিবাদ করতে পারে না। কোনবকম জানান না দিয়ে দূরে সরে যায়। এটাও এক ধরণের প্রতিবাদ। আননয়সি মোড অফ প্রোটেস্ট।

শেখবের নির্দেশমত বুধুয়া তার কোচিনে মাস কয়েক পড়তে এসেছে। না-মাইনের ছাত্র বলেই হয়ত, অন্য সহপাঠীদের মধ্যে বুধুয়ার জড়োসড়ো ভাবটা শেখর উপলব্ধি করতে পারত। কোচিন শেষে সবাই চলে গেলে, শেখর বুধুয়াকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে, আমার পড়ানো বুঝতে কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

বুধুয়া ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছে, না, মাস্টারজী।

— তাহলে! শেখর বলেছে, কিছু জিজ্ঞেস করো না! জানতে চাও না!

বুধুয়া চুপ করে থেকেছে। শেখর তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আমি যেটা বলছি বা শেখাচ্ছি, তারপরেও তোমার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। যে কোন বিষয়ে যত বেশী প্রশ্ন মনে জাগবে, সেই বিষয়টা তুমি অন্যের চেয়ে বেশী করে জানবে। শিক্ষার মূল কথাই হোল, প্রশ্ন করো। জানতে চাও।

অনু হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। মাঝে মধ্যে বাড়ি আসে। বুধুয়াকে সে ভালমত না-ই চিনতে পারে। যদিও কয়েক মাস আগে, হস্টেল থেকে বাড়ি ফেরার সেই ভয়ংকর রাতে, বুধুয়ার বাবা দেওধরের সহমর্মিতার কথা, অনুর ভোলা উচিত নয়। সে রাতে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেওধর যে ভাবে শেখবকে আগলে রেখেছিল, নিজে গাড়ি টেনে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, যেন তার নিজের মেয়ে ঘরে ফিরছে। মেয়ের

ইজ্জত রক্ষা করার জন্য, যে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে সে পিছপা নয়। অনুর কি মনে আছে সে রাতের কথা! নাকি মা এবং ভাই যারা বুধুয়াকে বিনা পয়সার ছাত্র হিসাবে একটু খেলো চোখে দেখে, তাদের মতো করে অনুও ভাবতে শিখেছে, মুড়ি মুড়কির একদর হতে পারে না। কি ভয়ংকর অনুর উচ্চারণ, ও আমাদের সিটির ছেলে নয়। ওর বাবা কি কনট্রাক্ট লেবার!

শেখর বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তার সারা শরীর জুড়ে অস্থিরতা। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। তার মানে, ছেলেমেয়ের মধ্যে সে তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তার সরু এক চিলতে শিকড়ও চারিয়ে দিতে পারেনি। পরিবর্তে ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের মতো করে প্রতিটি মানুষকে মাপতে শিখেছে তার সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বুনিয়াদের নিরিখে।

ক্রিস মাসের ছুটি কাটিয়ে অনু যেদিন হস্টেলে ফিরে গেল, তার সপ্তাহখানেক পরে একদিন হেডমাস্টারমশাই শেখরকে ডেকে বললেন, বাসুবাবু, ওপর থেকে চিঠি এসেছে, সামনের মাস থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খবরটা শেখরের কাছে নীল আকাশের বুক চিরে প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো এমনই আকস্মিক এবং অভাবনীয় ঠেকেছিল যে প্রথম কয়েক সেকেন্ড সে অপলক হেডমাস্টারমশায়ের মুখের পানে চেয়েছিল। হেডমাস্টাব আবার যখন বললেন, আই ক্যান শো ইউ দি লেটার। শেখর সম্বিৎ ফিরে পেল, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের চিঠি?

— হ্যাঁ। বলে হেডমাস্টার ছোট করে ঘাড় দোলালেন।

কারখানার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। বেশ কিছু কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। দক্ষ কিছু শ্রমিককে কেন্দ্রীয় সবকাবের অধীনস্থ অন্য কোন সার কারখানায় বদলি করা হবে। এসব শেখরের জানা ছিল। কিন্তু স্কুলটা পাকাপাকি বন্ধ হয়ে যাবে, এটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। একটি কারখানার চালু কয়েকটি ইউনিট বন্ধ হয়ে যাওয়া, আর সেই কারখানাব অনুমোদিত স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া তো এক কথা নয়। স্কুল বন্ধ হওয়া মানে, কারখানার ওপরতলা থেকে একেবাবে নিচু স্তর পর্যন্ত, সব কর্মীর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, অবস্থা যে এত দ্রুত এমন ভয়ংকর পরিণতির দিকে গড়িয়ে যাবে, শেখরের ভাবনা চিন্তায় তার মৃদু জানানও ধরা পড়ল না কেন! তবে কি এতদিন নিজের সম্পর্কে তার যে ধারণা ছিল বা অন্যেরা তাকে যেমনটি ভাবত, তেমন দূরদর্শী সে নয়!

দিন কয়েক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলায় মুড়িমাসি এসেছিল। শেখরের বউয়ের হাতে চারটি মুড়ির প্যাকেট দিয়ে বলল, এটা রাখ বহু। দাম লাগবে না। বেটা আমার অনেক

উপকার করেছে। দেহাতী বৃদ্ধাটি শেখরকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে। অবিবাহিত শেখর যখন নতুন চাকরি নিয়ে এখানে এসেছিল, তখন থেকে আজ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর মুড়িমাসির এ বাড়িতে যাতায়াত। ওর দুই মেয়ের বিয়েতে শেখব টাকা ধার দিয়েছিল। বৃদ্ধা সে টাকা শোধ করে দিয়েছে। এখনও মাঝে মধ্যে মাসের শেষে শেখরের থেকে টাকা ধার নেয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই টাকা শোধ করে দেয়। মুড়িমাসির সঙ্গে শেখরের নিজের লোকের মতো ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছে। এত বছর ধরে, একটু একটু করে। বৃদ্ধাকে এ বাড়ির সকলে পছন্দ করে। কেবল শেখরের স্ত্রী ছবি মাঝে মধ্যে অনুযোগের সুরে বলে, টাকা ধার নেওয়ার ব্যাপারে বুড়ি তোমায় পেয়ে বসেছে। এত বাড়িতে মুড়ি বিক্রি করে, কারোর বাড়িতে টাকা ধারেব সাহস পায় না। তোমার আস্কারাতেই ও ধরে নিয়েছে, টাকা চাইলেই পাওযা যাবে। তুমি যেন ওকে টাকা ধার দিতে বাধ্য।

হয়ত তেমন কিছু আঁচ করেই ছবি মুড়ির প্যাকেট মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে, এমনি এমনি দেবে কেন? চার প্যাকেট মুড়ির দাম নেই? আব তোমার ছেলের হাত একেবারে ফাঁকা। এ মাসটা আমাদেরই টেনেটুনে চালাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বসে শেখর দুজনের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল। ছবি না মুড়িমাসি, কে সঠিক, এটা পরিষ্কার করে বোঝবার জনাই ঘব ছেড়ে বেবিয়ে এল, কী পাগলামি করছো মাসি? এই বাজারে কেউ এমনি জিনিস দেয়? বৃদ্ধা নিজের কপালে চাপড় মেরে যেন কেঁদে উঠল, হাই বাপ, আমি কি জানি না, কি দিন আসছে! আর এক মাসও লাগবে না, এ তল্লাট বেবাক ফাঁকা হয়ে যাবে। মেবে লাল ভি' বলে শেখবেব পিঠে হাত বোলাতে লাগল, এ মুলুক ছেড়ে চলে যাবে। সব গাছ মরে যাবে। পানি শুকিয়ে যাবে। গরু ছাগল কুকুর পাখি কিছু থাকবে না। আমার মতো যাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই, তারা পড়ে থাকবে। আমাদের মাথার ওপব শকুন চক্কব দেবে।

মুড়িমাসি যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলছে, ভারি পানির আগে যেমন চারপাশ থমথম করে, পশু পাখি ডাকে না, সব লোক পড়িমবি ঘরে ফেবে, দেখ বেটা, এ মুলুকের অবস্থা এখন ওরকম আছে। চুপকে চুপকে সব লোক ভাগছে। কোনদিন তুই ভি লোটাকম্বল নিয়ে চলে যাবি। জানতে পারব না। ও বহু, এ মুড়ি বাখ। দাম দিবি না। দাম নিলে আমি নিমকহারাম হবো।

তার মানে মুড়িমাসিও জানতে পেরেছে স্কুলটা বন্ধ হয়ে যাবে। হয়ত শহরেব আনাচে কানাচে যাতায়াত আছে বলেই খববটা সে জেনেছে। কিন্তু কোন কিছু জানা আর সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা তো এক জিনিস নয়। শেখবও তো অনেক কিছু শুনেছে। তার সবটাই তো তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হযনি। যেমন স্কুল বন্ধের ব্যাপারটা। এই বিশাল কারখানাটিকে ঘিরে যাদের জীবিকা, তাদের প্রত্যেকেব ছেলেমেয়েই তো শেখবের স্কুলের

ছাত্রছাত্রী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের রায়ে নির্বাচিত কোন সরকার একসঙ্গে এত সংখ্যক ছেলেমেয়ের লেখাপড়া মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারে, কোন যুক্তিতেই এর কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

মুড়িমাসি চলে যাওয়ার পর শেখর ভেবেছিল অঙ্কের মাস্টারমশাই সুরেশবাবুকে ফোন করে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর করবে। পর মুহূর্তেই তার মনে হল, ব্যাপারটা যদি সত্যি না হয়. সুরেশবাবু ভাবতে পারে, শেখর আর পাঁচটা লে ম্যানের মতো গুজবে বিশ্বাস করে ভয় পেয়েছে। তা না হলে, অন্যেরা যেখানে শেখরের মতামত জানতে চায়, সেই শেখর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। রাতে শেখর ভাল করে ঘুমোতে পারল না।

আর তার কয়েকদিন পরে স্কুলে যাওযা মাত্রই হেডমাস্টারমশাই তাকে স্কুল বন্ধের চিঠিটির কথা বললেন।

চিঠিটা চলেও এল এক সপ্তাহের মধ্যে।

শেখর লক্ষ্য করল, দিন দশ পনেরোব মধ্যে অধিকাংশ কোয়ার্টার কেমন ম্যাজিকের মতো ফাঁকা হয়ে গেল। স্কুল যাওয়ার পথে যে কোয়ার্টারের বারান্দায় ভিজে জামাকাপড় মেলে থাকতে দেখল, ফেরার পথে দেখল সেই কোয়ার্টারটি ঝুপঝুপে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে। দরজা জানলা সব হাঁ করে খোলা বা বিকালে যে লোকটিকে দেখল পানেব দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেটে আগুন ধরাচ্ছে, পরদিন বাজাবে গিয়ে শুনল, সেই লোকটি ভোররাতে ফ্যামিলি নিয়ে এ শহর ছেড়ে চলে গেছে।

শেখর যে ব্যাপারটায় সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য হল এবং আহত বোধ করল, এখন কেউ আর তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে না কারখানার ভূত ভবিষ্যত সম্পর্কে। কেউ তার কাছে এসে জানতে চায় না, সত্যি সত্যি কী হচ্ছে! এর কোন বিহিত আছে কিনা! কী করা উচিত!

হেডমাস্টারমশাই তার হাতে চিঠিটা দিয়ে নিজের বন্ধ দু ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল ঠেকিয়ে দেখালেন, নো কমেন্টস। তার মানে এরপরে শেখবের আর কোন কথা বলা উচিত নয়। যেহেতু তার কোন কথাই খাটে না, আর তাই কোন মন্তব্য কবাও সাজে না। যেমন মহান্তি বিদ্রূপের সুরে বলে গেলেন, অনেক শিক্ষিত মানুষও ধরতে পারলেন না।

শেখরও চলে যাবে কাল বাদ পরশু, বুধবার। ছবির বিশ্বাস মঙ্গলের উষা বুধে পা বেখে যাত্রা কবলে, যাত্রা শুভ হয়। নিজের শহরে ফিরে গিয়েও শেখব সম্মানজনক কোন কাজ পাবেই পাবে। মাস্টারী না হোক, ভাল কোন অফিসে চাকরি। যদিও শেখর জানে, এই বয়সে নতুন কোন চাকরি পাওয়া অসম্ভব। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা তাব সামনে নেই। প্রবাসে আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থেকেও ছবিব কখনই নিজেকে একা অসহায এমন কিছু মনে হয়নি। বরং বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই সংসারের খুঁটিনাটি

সমস্ত বিষয়ে সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির আদেশ বা নিষেধের মুখোমুখি হয়ে তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়নি। ব্যক্তি স্বাধীনতায় অভ্যস্ত ছবি স্বেচ্ছাচারী না হলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন এমনটা ভেবে শ্লাঘা অনুভব করে। দীর্ঘ কুড়ি বাইশ বছর পরে দেশে ফিরে একান্নবর্তী সংসারে সে নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে পারবে, এ সম্পর্কে তার নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। হাঁড়ি আলাদা হলেও, শাশুড়ি-জা-ভাসুর-দেওর ও তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব ব্যাপারে তার মতামত যে নির্দ্বিধায় সবাই মেনে নেবে, এমনটা না-ই হতে পারে। ছবির মন খারাপ ওই একটি কারণেই। শিরোপা হারানো, সিংহাসনচ্যুত হওযার মতো এও যেন এক ধরণের পরাজয়। যেটা কাটিয়ে ওঠা কঠিন। মেনে নেওয়া কষ্টকর। স্বামী, ছেলেমেয়ে, সংসারে যা যা থাকার, এখানকার মতো দেশেও একইরকম থাকবে। তবু কিসের যেন একটা অভাব থাকবে। দেশে ফেরার দিন যত এগিয়ে আসছে, অহরহ ছবির বুকের ভেতরে কে যেন গুনগুন করছে, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় বলো! কে বাঁচিতে চায়!'

শেখরের কোচিং ক্লাসে ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন যে হারে কমে যাচ্ছে যে শেখর নিজের সম্মানটুকু ধরে রাখার জন্য নিজে থেকেই একদিন বলে দিল, তোমাদের আর আসতে হবে না। আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। বাবাকে বোলো, এ মাসের মাইনে দিতে হবে না।

দুচারজন জিজ্ঞেস কবল, মাস্টাবমশাই, এবার আমাদের কী হবে?

জবাব দিতে গিয়ে শেখরেব গলা ধরে এল, তোমাদের গার্জেনরা নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন। যে যেখানে যাবে, সেখানকাব স্কুলে ভর্তি হবে। একটু চুপ করে থেকে বলল, প্রাইভেট টিউটর সব জায়গাতেই আছে। হয়ত দেখবে, তাঁরা আমাব চেয়েও ভাল পড়ান।

দেওধরের ছেলে বুধুয়া এত কিছু শোনার পরেও রোজ আসতে লাগল। লাজুক প্রকৃতির ছেলেটি প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে শেখরের পড়ার ঘরে একা একা বসে থাকে। শেখর আর পড়ায় না। বুধুয়ার সঙ্গে এলোমেলো কথা বলে কিছুক্ষণ। কোন কোন দিন ছবিকে বলে, ঘরে কিছু থাকলে দাও না। এত দূর থেকে আসে! বুধুয়া খেতে চায় না। সে কেবল শেখরের মুখের পানে অপলক চেয়ে থাকে। বুধুয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোন কথা শেখরের জানা নেই। বুধুয়াদের দেশ বলে হয়ত কোন জায়গা আছে। কিন্তু সেখানে ফিরে গিয়ে অন্য কোনভাবে রোজগার করে সংসার প্রতিপালন করা এবং ছেলেমেয়েব লেখাপড়া শেখানোর মতো কোন উপায় বুধুয়ার বাবার নিশ্চয়ই নেই। যদি থাকত, তাহলে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে এত দূরে এই শহরে ছুটে আসত না। শেখরেব মন খারাপ হয়ে যায়। তার অন্য ছাত্রছাত্রীরা যেমন তেমনভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পাবলেও, বিনা বেতনের এই ছাত্রটিকে ন'ক্লাস পর্যন্ত পড়েই থেমে যেতে হবে। লেখাপডার প্রতি যত আগ্রহই থাক না কেন, বাবার সামান্য

রোজগারটুকু বন্ধ হয়ে গেলে, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বুধুয়াকেও পয়সা কামানোর ফন্দিফিকির খুঁজতে হবে। বুধুয়ার মুখের পানে চেয়ে শেখরের সারা শরীর কেঁপে ওঠে। এমনও তো হতে পারে, পরিস্থিতির চাপে নিষ্পাপ নিরীহ ছেলেটি কয়েক বছর পরে এ অঞ্চলের একজন দাগী আসামী, চোরাচালানকারী, তোলাবাজ, এই জাতীয় কিছু হয়ে উঠল!

বুধুয়ার সঙ্গে একদিন তার বাবা দেওধর এল। ছবি চোখমুখ কুঁচকে ফিসফিস করে বলল, নাও হল! এবার হয়ত বলবে, মাস্টারজী কুছু হেল্প করুন। আমাদেরই যে কে দেয়, তার ঠিক নেই!

শেখর বিরক্তিভরা গলায় বলল, আ! চুপ করো তো।

— এসো। এসো। শেখর দেওধরকে ডাকল, এদিকে কোন কাজে এসেছিলে নাকি?

— নেহী। বলে দেওধর কয়েক মুহূর্ত শেখরের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই হু হু করে কেঁদে উঠল, এ কী হল মাস্টারজী! আপনার মতো সাধুসন্ত মানুষও চলে যাচ্ছেন!

— সে আর কী করা যাবে বলো! শেখর ক্লান্ত গলায় টেনে টেনে বলল, স্কুলটাই যখন বন্ধ হয়ে গেল!

— কিন্তু কেন এমন হল মাস্টারজী?

— জানি না। শেখর আস্তে করে ঘাড় নাড়ল।

— সব কিছু নসীব কা ফির? নাকি মাস্টাবজী?

শেখর চুপ করে রইল। অদ্ভুত এক নীরবতা। অথচ প্রতিটি দিনের মতোই আজও রোদ উঠেছে। বাতাস বইছে অল্প অল্প। সেই বাতাসে গাছেব সবুজ পাতারা দুলছে। কৃষ্ণচূড়ার মগডাল থেকে একটি ফুল খসে পড়ল মাটিতে। মিষ্টি সুরে একটি পাখিও ডেকে উঠল। অল্প সময়ের জন্য হলেও শেখর যেন নিজেব মধ্যে ছিল না। হঠাৎ কে যেন বহুদূর থেকে তাকে ডাকল, মাস্টারজী?

শেখর চমকে উঠে দেওধরের মুখের পানে তাকাল, হ্যাঁ? কী হয়েছে?

—কাল আপনি কোন ট্রেনে যাবেন?

— ভোরের ট্রেনে। কেন বল তো?

— আমি আর বুধুয়া আপনার সামাল টিশানে পৌঁছে দোব। কুছু চিন্তা করবেন না।

— আমি গাড়ি বলে রেখেছি।

— তো ঠিক আছে। দেওধর হাত নেড়ে বলল, আমি ভাইয়ের রিক্সা আনিয়ে রাখব। মাইজী দিদিমণি আমার রিকসায় যাবে। না বলবেন না, মাস্টারজী। একটু থেমে বলল, বুধুয়াব ইচ্ছে, ও ভি টিশানে যাবে। আপনার ট্রেন ছাড়িয়ে গেলে, ও হাত নাড়বে। আজ আমি চলে যাচ্ছি মাস্টারজী।

বুধুয়া জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথা নিচু করে। শেখর ওর দিকে চেয়ে হাসার চেষ্টা করল, তুমি গেলে না? কিছু বলবে?

— আমি আরও লেখাপড়া শিখব মাস্টারজী।

— কিন্তু স্কুল তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

— আমি ভবনগরের স্কুলে ভর্তি হব।

— ভবনগর? শেখর ভ্রূ কোঁচকাল, সে তো অনেক দূর।

— সাইকেল চালিয়ে যাব।

— তোমার কষ্ট হবে না?

বুধুয়া মাথা দোলাল, না।

— কিন্তু পড়াশুনোর খরচ! মানে বই খাতাপত্র, স্কুলের মাইনে। একটু থেমে বলল, তোমার বাবা দিতে পারবে?

শেখরের প্রশ্নে বুধুয়া কেমন হকচকিয়ে গেল। আশাহতের মতো করুণ হয়ে উঠল তার চোখমুখ। তারপর হঠাৎই সোৎসাহে বলে উঠল, বাবুজীকে আপনি বলে দেবেন মাস্টারজী। বাবুজী আপনার কথায় না বলবে না।

শেখর নিরুত্তর রইল। লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে একজন কিশোরের এমন আন্তরিক টান তাকে যেমন মুগ্ধ করল, আবাব মনের গভীরে কষ্টও অনুভব করল। সে জানে বুধুযার বাবাকে সে যেভাবেই বোঝাক না কেন, ভাত কাপড়ের চিন্তায় বিপর্যস্ত দেওধর, কোন অবস্থাতেই ছেলের পড়াশুনোব খবচ সামলাবার কথা ভাবতেই পারবে না। শেখব আস্তে করে মাথা তুলে দেখল, বুধুয়া তাব দিকে স্থির চেয়ে রয়েছে। সে চাউনি আশ্বাসের সমর্থন খুঁজছে। মনোমত একটা জবাব আশা করছে। শেখর লম্বা করে শ্বাস ফেলল, এখন যাও।

নিষেধ করা সত্ত্বেও বুধবার ভোররাতে দেওধর শেখরের কোয়ার্টারের সামনে রিকসার হর্ণ বাজাতে লাগল। মা মেয়ে দেওধরের রিকসায় বসল। শেখর আব বাপটু অন্য একটি রিকসায়। দুটি রিকসার পিছনে বুধুয়ার সাইকেল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। মোড়ে মোড়ে আলো জ্বলছে। বাতাসে অল্প ঠাণ্ডা ভাব। অন্য বছরে এ সময়ে কিছু লোক পথে বেড়িয়ে পড়ে। কিছু কিছু দোকানপাটও খুলে যায়। আজ কিন্তু সারাটা পথ বড় নির্জন। নিস্তব্ধ।

ট্রেন আসার ঘোষণা হল। রিজার্ভেশন অনুযায়ী কোথায় তার নির্দিষ্ট বগিটি দাঁড়াতে পারে, আন্দাজ করে নিয়ে শেখর বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। দেওধব আর বুধুয়া বেডিং সুটকেশ ব্যাগপত্তব সব বয়ে নিয়ে এল। সিগারেট ধরিয়ে শেখব চাবপাশ দেখতে লাগল। এই স্টেশন থেকে এই সময়ে বহুবার সে দেশের বাড়িতে গেছে।

সপরিবারেও গেছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু আজকের যাওয়াটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আর কোন দিনই এই প্লাটফর্মে এভাবে তাকে কেউ ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে না। রুমাল বার করে চোখ মুছল শেখর। আধখাওয়া সিগারেটটা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুধুয়া তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দিকে চোখ ফেরাতেই নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, বাবুজীকে বলেছিলেন, মাস্টারজী?

শেখর স্পষ্ট করে ঘাড় নাড়ল, না।

— তাহলে? বুধুয়ার গলা ধরে এল, আমার পড়াশুনোর কী হবে?

শেখর দেখল বুধুয়ার দু চোখ জলে ভরে গেছে। শেখরের বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। এই শেষ মুহূর্তে মিথ্যে বলাটা ঠিক হবে না বুঝেও সে বুধুয়ার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এল, হবে। কিছু একটা হবে।

— হবে? বুধুয়ার চোখমুখে রোদ্দুর ফুটে উঠল, আপনি বলছেন মাস্টারজী? তার মানে ইসকুলটা আবার খুলে যাবে?

— স্কুলটা? শেখর চমকে উঠল, তা জানি না।

— আমার মনে হচ্ছে মাস্টারজী! বুধুয়ার গলার স্বরে ঘোর লেগেছে, একদিন না একদিন ইসকুলটা আবার খুলবেই। একটু চুপ করে থেকে বলল, তখন আপনি আবার ফিরে আসবেন তো?

— খুলবে বলছ? শেখর আস্তো গলায় বলল।

— হ্যাঁ মাস্টারজী। জরুর খুলবে। আপনি দেখবেন।

মাইকে ঘোষণা হল ট্রেন আগের স্টেশন ছেড়েছে। তার মানে মিনিট দশের মধ্যেই গাড়ি এসে পড়বে। বুধুয়া তাব কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ থেকে একটি খাতা বার করে শেখরের সামনে মেলে ধরল, কিছু লিখে দিন মাস্টারজী।

শেখর অবাক গলায় বলল, কী লিখব? একটু থেমে বলল, কী করবে তুমি লেখাটা নিয়ে?

বুধুয়া চুপ করে রইল। শেখর যখন দ্বিতীয়ভার বলল, বল? কী করবে? বুধুয়া মাটির থেকে চোখ তুলে শেখরের মুখের পানে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে যেন অনেক দূরের দিকে চেয়ে ধীর গলায় বলল, আপনার লেখাটা আমি সারাজীবন আগলে রাখব মাস্টারজী।

শেখরের মনে হল এমন কঠিনতম মুহূর্ত তার জীবনে আগে কোনদিন আসেনি। কী লিখবে সে? যখন পালছেঁড়া, হালভাঙ্গা এক নৌকার মাঝি হয়ে অকূল সাগরে কোথায় ভেসে চলেছে নিজেই জানে না, তখন আগামী প্রজন্মের একটি কিশোর তার প্রতিশ্রুতির ওপর অপাব আস্থা রেখে বাঁচার দিশা খুঁজছে! এ কি কোন রহস্য! নাকি

কালের অমোঘ নিয়ম মেনে প্রত্যেকের জীবনে যেমন, তার ক্ষেত্রেও তেমনই এক মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন চক্রব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়েও একটি আন্তরিক দাবির প্রত্যুত্তরে, একটি সৎ নির্ভীক উচ্চারণই কাম্য।

বুক পকেট থেকে পেন বার করে শেখর, দু চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবল অল্পক্ষণ। তারপর বুধুয়ার হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে বড় বড় অক্ষরে ফাঁক ফাঁক করে লিখল,

দেয়ার ইজ নো নাইট সো লং
হুইচ ডাস নট এন্ড
অ্যাট এ ডন।

ট্রেন ঢুকে পড়েছে। ঝমঝম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

অন্তরালের কুশীলব

এক

— মাস্টারমশাই আছেন নাকি? আদিনাথ গলাটাকে যথাসম্ভব নামিয়ে ডাকল।

— হ্যাঁ। যাই। এক ডাকেই সাড়া দিলেন উদয়বাবু।

আদিনাথের আশ্চর্য লাগল, ঘর ভর্তি ছাত্রছাত্রীর শোরগোলের মধ্যেও মাস্টারমশাই তার ডাক ঠিক শুনতে পেয়েছেন। আদিনাথের লজ্জা করতে লাগল. বৃদ্ধ মানুষটি হয়ত পাওনাদারের গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে, যত আস্তেই ডাকা হোক না কেন, ঠিক শুনতে পান। এক চান্সেই।

আদিনাথের মতো এ শহরের অনেক ব্যবসাদারই উদয়বাবুর ছাত্র। আজ তার যেমন সংকোচ বোধ হচ্ছে, অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়ত এমনটাই হয়। অনন্যোপায় বলেই তো আসা। তা'ও যদি ব্যাপারটা একান্তভাবে মাস্টারমশায়ের হোত, অন্যেরা কে কী করত জানা নেই. আদিনাথ কখনোই এভাবে বাড়ি অব্দি ধাওয়া করত না।

আদিনাথ তার বাবা বদ্যিনাথের কাছে শিখেছে, ব্যবসা করতে গিয়ে যেটুকু অসৎ কাজ করতে হয়, ভালমানুষকে কিছু ছাড়ছোড় দিলে, তাতে সেই অসৎ কাজেব পাপটুকু অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। বদ্যিনাথ লেখাপড়া খুব কম জানলে কি হবে, কিসে কী হয়, এই হিসেব নিকেষে পাকা মাথার লোক ছিল। থেকে থেকেই আওড়াত —

নিলি কিন্তু দিলি না
তাই তো কিছুই পেলি না।

দরজা খুলে আদিনাথকে দেখে উদয়বাবু নিস্পৃহ গলায় ডাকলেন, ভেতরে এসো। আদিনাথ ইতস্তত করছিল। উদয়বাবু মাস্টারি ভঙ্গিতে আঙ্গুল নেড়ে বললেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব কথা হয় না।

অগত্যা আদিনাথ উদয়বাবুর পিছন পিছন বাড়ির ভেতরে এল। সেকেলে আমলের লম্বা একটা দালান পেরিয়ে ছোটমত একটি ঘরে আদিনাথকে নিয়ে এলেন উদয়বাবু। সেখানে চৌকির ওপর পাতা পাতলা একটি বিছানা দেখিয়ে বললেন, এখানে একটু বসো। পা তুলে আরাম করে বসো। আমি এখুনি আসছি। ছেলেমেয়েগুলোকে ছুটি দিয়ে আসি। ঘরেব দবজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, দু চার মিনিট দেবী হলে চলে যেও না কিন্তু। দরকাবী কথা আছে।

উদয়বাবু চলে যাওয়ার পব আদিনাথ ঘুরে ঘুরে ঘরটিকে দেখতে লাগল। এটি

নিশ্চয়ই মাস্টারমশায়ের নিজস্ব ঘর। দেওয়াল আলমারি ভর্তি ঠাসা বই। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটি মানপত্র। এমনিতেই বাংলা যুক্তাক্ষরের সব উচ্চারণ আদিনাথের ঠিকমত হয় না। তার উপর মানপত্রের বাংলাগুলিও কেমন সেকেলে গঠনের। মানে বোঝা তো বিশ বাঁও জলের ব্যাপার।

আজ অনেক বছর পরে আদিনাথের আফশোস হতে লাগল। সেদিন মাস্টারমশায়ের কথা ফলো করার পরিবর্তে বাবার ব্যবসার কাঁচা পয়সার লোভটুকু জীবনের সার বুঝে ফেলার জন্য আখেরে তার ক্ষতিই হয়েছে। মানপত্রটি ঠিকমত পড়তে না পেরে আদিনাথের মন খারাপ হয়ে গেল। বইগুলে যে নেড়েচেড়ে দেখবে, তার উপায়ও নেই। টেবিলে একটি খবরের কাগজ পড়ে। সেটিও আবার ইংরেজী। গম্ভীরভাবে পাতা উল্টে যে দেখবে তাতেও ভয় উৎকণ্ঠা। কখন মাস্টারমশাই হুট করে ঘরে ঢুকে পড়েন। হয়ত স্কুল জীবনের মতো করে বলে বসবেন, যা পড়লি, মানেটুকু বল তো দেখি।

অগত্যা আদিনাথ মাস্টারমশায়ের নির্দেশমত দু পা তুলে বাবু হয়ে বসে রইল চৌকিতে। মন খারাপ হতেই পারে। কিন্তু তার কারণটা যদি ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটি আবিষ্কারের পর্যায়ে পড়ে, তখন নিজের নির্বুদ্ধিতাকেই দায়ী করতে হয়। আদিনাথ কি ছাই জানত যে মাস্টারমশাই তাকে আপ্যায়ন করে ভেতরের ঘরে এনে বসাবে? বা 'বসো' বলে বইয়ের স্তূপের ওপর তাকে বসিয়ে রেখে 'আসছি' বলে চলে যাবেন? অনভ্যস্ত পরিবেশে একা একজন মানুষ কতক্ষণ বসে থাকতে পারে চুপ করে? ভাবনাচিন্তাও কারোর তাঁবের গোলাম নয়। কোথাও কিছু নেই, রাশি রাশি বইপত্র দেখে আদিনাথের হঠাৎই মনে হল, জীবনের সব স্বাদই সে অল্পবিস্তর পেয়েছে, কেবলমাত্র পড়াশুনোর আনন্দটুকু ছাড়া। এটা বাদেও এতদিন তার বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে কী যে হল! প্রথমে মন খারাপ। তা থেকে আফশোস। হাজার চেষ্টা করেও আদিনাথ অন্য ভাবনায় মনটাকে নিয়ে যেতে পারছে না। দাঁতের ফাঁকে মাছের কাঁটা আটকে গেলে জিভের যেমন অবস্থা হয়, অজান্তেই বারবার জিভটা সেখানে চলে যাবেই যাবে, আদিনাথের মনের অবস্থাও ওই জিভের মতো। এ চিন্তা ও চিন্তা ঘুরে ফিরে ওই পড়াশুনো না করার খেদে গিয়ে ঠেকছে।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো আদিনাথ। দশ মিনিটের মতো বসে রয়েছে। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতকাল বসে রয়েছে চৌকিটার ওপর! কে জানে এখনও কত যুগ এমনিভাবে মন খারাপ নিয়ে বসে থাকতে হবে!

কোন কারণে মানুষের মনের মধ্যে পরিচিত গতের বাইরে একটু অন্যরকম ভাবনাচিন্তা ভিড় করলে, অনেক সময়েই দেখা যায়, তা মানুষটিকে আমূল পাল্টে দেয়। আদিনাথের ক্ষেত্রে কী হোত বলা শক্ত। কিন্তু পরিবর্তনের সেই পর্যায়টুকু আসার আগেই মাস্টারমশায়ের ডাক সে শুনতে পেলো। অত্যন্ত চাপা গলায় কিন্তু বেশ সুরেলা শুনতে, ঘুম আসছে নাকি আদিনাথ? ইচ্ছে করলে শুয়েও পড়তে পারো।

যেটুকু ঘোর বিপত্তি জেগেছিল মনে, নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। আদিনাথ সোজা হয়ে বসল, আসুন মাস্টারমশাই। বসুন। বলে চৌকির ওপর নিজে খানিকটা সরে গিয়ে মাস্টারমশায়ের বসার জায়গা করে দিল।

কী ভাবে যে কথা শুরু করবে আদিনাথ ভেবে পাচ্ছিল না। সে যেমন জানে কেন এসেছে, মাস্টারমশাইও তার আসার কারণটুকু ধরতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে আদিনাথ চোখ মুখ গরম করে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিত, কী ভেবেছেন মশাই? ধার করলে শোধ দিতে হয়, এটুকু ভদ্রতাও জানা নেই?

মাস্টারমশাইকে তো আর এভাবে বলা যায় না। সজ্জন মানুষ। নিপাট ব্যবহার। এই যেমন নরম করে বললেন, পা তুলে আরাম করে বসো। বা ঘুম পেলে শুয়ে পড়তে পারো। এখন আদিনাথের পিঠে আস্তে করে হাত বুলিয়ে এমনভাবে বলছেন, তোমাদের যখন দেখি, তখন নিজের ছেলেটার কথা ভাবলে বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে। আমার এক তরকারি নুনে বিষ, আদিনাথ।

আদিনাথের চোখে প্রায় জল এসে গেল। মাথা তুলে মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। কোনরকমে জড়ানো গলায় বলল, আমার দোষ ধরবেন না মাস্টারমশাই। আপনার মতো দেবতাতুল্য মানুষের কাছে কথা পাড়তেই লজ্জা করছে।

— নো, নেভার। মাস্টারমশাই দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ালেন, তুমি ন্যায্য পথে আছো। আমাকে বলতে এসেছ বলে আমি কিচ্ছু মনে করিনি। একটু থেমে বললেন, আমি কি বুঝি না, নেহাৎ আমার ছেলে বলে তোমরা এখনও ওকে দড়িতে বেঁধে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাওনি!

— ছিঃ ছিঃ! একি কথা বলছেন? আদিনাথ সত্যি সত্যি শিউরে উঠল। দড়িতে বেঁধে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানোর মতো নিষ্ঠুর নৃশংস পদ্ধতির কথা তার মাথাতেও আসেনি।

— ঠিকই বলছি। মাস্টারমশায়ের দু চোখ লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে, ওই অকাল কুষ্মাণ্ডটার জ্বালায় আমার মান সম্মান সব ধ্বংস হয়ে গেল। সবাই তো আর তোমার মতো নয় যে আমার দুঃখ কষ্টটা বুঝতে পারবে। বাজারওলা দুধওলা পানবিড়ির দোকানদার যে সে এসে যা তা বলে যাবে, আর আমায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে সেইসব আকথা কুকথা শুনতে হবে!

— তমাল কি আর এ বাড়িতে একদমই আসে না? আদিনাথ মাস্টারমশায়ের রাগ প্রশমনের কথা ভেবে প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল।

ফল হল বিপরীত। আদিনাথের প্রশ্নে মাস্টারমশাই ধিকি ধিকি থেকে দপ করে জ্বলে উঠলেন, আসে। আমি যখন বাড়ি থাকি না। গর্ভধারিণীর কাছে প্লে অ্যাকটিং করে টাকাপয়সা, ঘর গেরস্থালির টুকিটাকি জিনিসপত্র যা পায় হাতিয়ে নিয়ে যায়। তারপরেও পাওনাদারেরা আসে। এই যেমন তুমি এসেছ।

মাস্টারমশায়ের শেষের কথাটায় আদিনাথ লজ্জা পেল। আস্তে আস্তে বেশ সংকুচিত গলায় বলল, আমি কখনোই আসতাম না। মহাজনের কাছে আমারও বেশ কিছু ধার পড়ে গেছে। তাগাদা দিচ্ছে।

— সেটাই স্বাভাবিক। সে'ও তো ব্যবসা করছে। দানসত্র খুলে বসেনি। মাস্টারমশাই একটু থামলেন, শোন আদিনাথ, এখন থেকে আমি স্ট্রিক্ট। মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা হাজত কোর্ট যাই হোক না কেন, আমি আর একটি পয়সাও মেটাবো না। তাতে যদি ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তাই সই। দুর্জনকে দয়া মায়া দেখিয়ে আমি যে পাপ করেছি, নরকেও আমার স্থান হবে না।

আদিনাথ একটু থমকে গেল। এতক্ষণ মাস্টারমশাই সম্পর্কে তার মনে যেটুকু অনুকম্পা তৈরী হয়েছিল, মুহূর্তে উবে গেল। মাস্টারমশাই ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন, কুলাঙ্গার ছেলের ধার বাকি আর তিনি পাইপয়সা মেটাবেন না। অথচ আদিনাথ তমালের থেকে নয় নয় করে সাত আটশো টাকা পাবে। আদিনাথ অন্য পাওনাদারদের কাছে খোঁজখবর করেই এসেছে যে মাস্টারমশাই নিজের মান সম্মান রক্ষা করার জন্য ছেলের কর্জ নিজেই শোধ করছেন। নিজের ভালমানুষি তুলে ধরার জন্য আদিনাথ বাধ্য হয়েই মহাজনের গল্পটা ফেঁদেছে। গল্পটা মাস্টারমশাই খেয়েও ফেলেছিলেন বেশ। তারপরেই দুম করে পেমেন্ট না করার কথা ঘোষণা করলেন। আদিনাথ যদি বুদ্ধি করে আর কয়েকটা দিন আগে আসত। এখন কী হবে?

আদিনাথ যতটা সম্ভব বিনীত গলায় বলল, যা হয়ে গেছে স্যার, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। মুখে আপনি যাই বলুন না কেন, একটা মাত্র ছেলেকে ফেলতে পারবেন না। আর তার জন্যে আমার মতো একজন অপদার্থ ছাত্রের কাছে ঋণী থাকবেন, তা কখনোই হয় না।

— আলবাৎ হয়। ওকে আমি মন থেকে ছেঁটে ফেলেছি। ওর এক কণা ধারও আমি আর শোধ করব না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবার ওকে তোমরা জেলহাজতে ভরো বা দল বেঁধে আচ্ছা করে ঠ্যাঙ্গানি দাও, যা খুশি করো। চা খাবে আদিনাথ?

মনের দিক থেকে আদিনাথ আধমরা হয়ে গেছে। এমন উল্টোছিরি হবে জানলে সে মাস্টারমশাইয়ের কাছে আসত না। অন্য কোনরকম চিন্তাভাবনা করত। ভেতরের ঘরে বসে বইপত্র মানপত্র ইংরাজী খবরের কাগজ এইসব দেখে নিজের দুঃখ কষ্ট না বাড়িয়ে মাস্টারমশাইকে সরাসরি বলত, আপনি বাবা। ছেলে কুলাঙ্গার বা মায়ের আদরে নষ্ট হয়ে যাওয়া বাঁদর, এসব শুনতে আসিনি। এত টাকা পাব। দয়া করে মিটিয়ে দিন। এক খেপে না পারেন, কয়েক খেপে দিন। তা না হলে এই আমি বসলাম।

আরও কত কী করা যেত!

মাস্টারমশায়ের কাছে ভাল সাজতে গিয়ে এখন ঢোঁড়া সাপের ব্যাঙ গেলার মতো

অবস্থা হয়েছে তার। না পারছে গিলতে, না ওগরাতে।

আবার সহজে হাল ছাড়ার পাত্র আদিনাথ নয়। সে জানে এ ক্ষেত্রে ধৈর্যই একমাত্র উপায় যা দিয়ে মাস্টারমশাইয়ের জেদ গোঁ-কে টলানো যেতে পারে। একে শিক্ষক, তায় আবার সবেধন নীলমণি একটি ছেলের পিতা। সামাজিক চক্ষুলজ্জার ব্যাপার যেমন আছে, স্নেহ মায়ার বন্ধনটাকেও কেটে ছেঁটে ফেলা অত সহজ কাজ নয়। এখন এই মুহূর্তে রাগে টগবগ করে ফুটছেন। আঁচ ঝিমিয়ে গেলে হয়ত দেখা যাবে আদিনাথের হাত দুটি ধরে কান্নাভেজা গলায় বলছেন, তুমি কিছু মনে করো না আদিনাথ। রাগের মাথায় কী বলতে কী বলেছি! আর দ্যাখো, তমালের কানে যেন এসব কথা না যায়। শিল্পী মানুষরা একটু ভাবপ্রবণ হয়। এসব শুনতে পেলে অভিমানের বশে কী করতে কী করে বসবে! তখন আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

এইসব সাত পাঁচ চিন্তা করে আদিনাথ প্রসঙ্গ পাল্টে প্রথমে স্কুল জীবনের গল্প শুরু করল। তার মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মাস্টারমশায়ের গুণকীর্তন। আর পাঁচ ভাগের মধ্যে নিজের অপরিণামদর্শিতা, ঠিকমত পড়াশুনা না করার ক্ষোভ দুঃখ। তমাল যে একজন জন্মশিল্পী এবং তার যথোপযুক্ত সম্মান জুটল না, এই হতভাগা দেশ বলে, এই ধরণের কথাবার্তা একাধিকবার বলল। মাস্টারমশাই দু চোখ বন্ধ করে সব শুনলেনও। আদিনাথ কিছুটা আশ্বান্বিত হল। দ্বিগুণ উৎসাহে বলল, যাই বলুন মাস্টারমশাই, তমাল আমাদের শহরের গৌরব। এক ডাকে সবাই চেনে ওকে।

এই অব্দি মাস্টারমশাই চোখ বন্ধ করে শুনলেন। আচমকা বন্ধ দু চোখ খুলে আদিনাথের দিকে চেয়ে হাত নাড়লেন, ব্যাস, ব্যাস। অনেক গুণকীর্তন করেছ। তুমি বাড়ি যাবে তো? একটু চুপ করে থেকে বললেন, যদি অন্য কোন কথা বলো, বসতে পারো। তবে আমি যা মনস্থির করেছি, তার নড়চড় হবে না। তাতে তুমি যদি আমার নামে মন্দ কথাও বলে বেড়াও, আমার কিস্যুটি হবে না।

আদিনাথ বুঝতে পারল, সহজ চলতি পদ্ধতিতে তো নয়ই, কোনওভাবেই মাস্টারমশাইয়ের মনোভাব বদলানো যাবে না। এখন উঠে না পড়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। যদিও রাগে তার সারা শরীরে আগুনের হলকানি ছুটছে, অনেক কড়া কড়া কথা জিভ হড়কে বেরিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছে, তবু সে বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে যথাসম্ভব নরম গলায় বলল, এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না, মাস্টারমশাই। যখন যা দরকার, কোনরকম 'কিন্তু' করবেন না। আপনার একটু সেবা করতে পারলে জন্ম সার্থক মনে করব। আর ভগবানের দয়ায় তমালের মতিগতি ভাল হলে তখন না হয় সুবিধেমতন যেমন যেমন পারবেন ...।

— আবার? আবার সেই এক কথা? আদিনাথের কথা শেষ হবার আগেই মাস্টারমশাই গর্জে উঠলেন, আমি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি। আমার মুখের কথার

সঙ্গে কাজের কোন ফাঁক নেই। মুখ দিয়ে একবার যেটা উচ্চারণ করি, তা ফেরৎ নেওয়ার কোন উপায় নেই, আদিনাথ। এতক্ষণ রইলে এক কাপ চা খেলে পারতে!

দুই

উদয়বাবুর হিসেবমত তাঁর একমাত্র ছেলে তমাল, না মানুষ না জন্তু। কলেজে পড়তে পড়তে সেই যে নাটকের ভূত মাথায় ঢুকল, তাতেই উদয়বাবুর সব হিসেব ওলোটপালোট হয়ে গেল। উদয়বাবু প্রথমে ভেবেছিলেন, সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ছেলেদের মাথায় শিল্প সাহিত্যের পোকা নড়ে ওঠে। তবে তার স্থায়িত্ব খুব বেশি দিন হয় না। শিল্পের জন্য উৎসর্গীত ছেলেমেয়েদের জাতই আলাদা। ছোট থেকেই তাদের চিন্তাভাবনা কাজকর্ম অন্য পাঁচটা ছেলেমেয়েদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির হয়। তারা বেহিসেবী ভুলো স্বভাবের হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়াদাওয়া করে না। বাড়ি ফেরার সময়জ্ঞান থাকে না। শিল্পের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিকে অনায়াসে দু পায়ে ঠেলে দিতে পারে।

তমালের মধ্যে শিল্পীসুলভ কোন লক্ষণই উদয়বাবুর চোখে পড়েনি কোনদিন। মাস্টারের ছেলে যেমন হয়, লাজুক, বিনীত, পড়াশুনায় মনোযোগী এবং কিছুটা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, সব বৈশিষ্ট্যই তমালের মধ্যে ছিল। উদয়বাবু ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হলেও, কমপক্ষে তাঁর মতো একজন শিক্ষক হবেই। এখন স্কুল মাস্টারের মাইনে ভাল। আগামী দিনে টিউশনের বাজার আরও চড়া হবে। সন্তানকে ঘিরে সব অভিভাবকেরই কিছু পরিকল্পনা ভবিষ্যত কল্পছবি থাকে। উদয়বাবুও তার ব্যতিক্রম নন। সকাল করে ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ি দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবেন। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যাবেন। নাতি নাতনির সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করবেন। এই ধরণের ছক মনে মনে তৈরী করে রেখেছিলেন।

আচমকা কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল! নীল আকাশের বুক চিরে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে, অতি বড় সাবধানী মানুষও যেমন সঙ্গের ছাতাটি খুলতে ভুলে যান, উদয়বাবুর অবস্থা হল ঠিক সেইরকম।

কলেজের সোসালে তমাল অভিনয় করবে। উদয়বাবুর স্ত্রী রীতিমত উঁচু গলায় যাতে দু চারজন প্রতিবেশী শুনতে পায় এমনিভাবে বললেন, তমাল কলেজের নাটকে হিরোর পার্ট করবে। উদয়বাবু তেমন খুশি না হলেও ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, খুব ভাল। এরপর পাড়ার ক্লাবের নাটকে তমাল দেবদাস টাইপের একটি ব্যর্থ প্রেমিকের রোল করল। সবাই ধন্য ধন্য করল। উদয়বাবুর সাতাশ বছরের শিক্ষক জীবনের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সেই প্রথম যেন একটু অন্যরকম মনে হল, তমালের চালচলন, কথাবার্তার স্টাইল, তাকানোর ভঙ্গিমা। নিজে কানে একদিন শুনলেন, তমাল তার মা'কে বলছে, শিল্পের জন্য সব ছাড়া যায়। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে শিল্পকে ছাড়া যায় না।

উদয়বাবুর হাসি পেল। তমালের অল্প শিক্ষিতা মা নিশ্চয়ই ছেলের কথার গূঢ় অর্থটুকু

ধরতে না পেরে ভেতরে ভেতরে আনন্দে ফুলছেন। আর তমালও ভাবছে দেবদাসের রোল করে কিছু ক্ল্যাপ কুড়িয়ে রাতারাতি সে বড়ুয়া সাহেব হয়ে যাবে। মঞ্চ কাঁপাবে শিশির ভাদুড়ির মতো অভিনয় করে।

এই অব্দি উদয়বাবুর সহনশীলতার মধ্যে ছিল। কিন্তু যেদিন তিনি শুনতে পেলেন, তমাল তার এক নাট্য সহকর্মীর বোনকে গোপনে রেজিস্ট্রি করেছে এবং স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে একটি নাটকের দল গড়ে গ্রামেগঞ্জে 'লোকশিক্ষে'র জন্য নাটক করে বেড়াবে, নাটককে তৃণমূল স্তরে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছে, উদয়বাবু নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। এর মধ্যে তিনি কিছু কুচক্রী মানুষের ছায়া দেখতে পেলেন।

ছেলেকে শাসন করে নিজের মনোমত পথে ফিরিয়ে আনবেন না অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে সমাধানের রাস্তা তৈরী করবেন, এর জন্য যে ধরণের মনের জোর থাকা দরকার, তা উদয়বাবুর নেই। ফলে নিজের সাহস বুদ্ধি এবং ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি একটিই সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন, সস্ত্রীক তমালকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললেন।

এখন এমন একটা সময় যখন প্রতিবেশী প্রিয়জন কেউ কারোর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিরোধীতা বা সমর্থন কিছুই করে না। ফলে তমালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উদয়বাবুকে খুব বেশি সাহস বা সুচিন্তিত কোন কৌশল প্রয়োগের কথা ভাবতে হল না। তমালের মা কান্নাকাটি করলেন। দু তিনবার সংজ্ঞা হারালেন। এতে উদয়বাবু একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি জানেন মহিলারা আবেগপ্রবণ। চোখের আড়াল হলেই আস্তে আস্তে মনের আড়ালে চলে যায় সবকিছু।

বাবার নির্দেশে তমাল ঘাবড়ে গেল না। বরং তার মনে হল এমনটিই হওয়ার কথা ছিল। যে কোন শিল্পীকেই কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। শিল্পের পথ অনুর্বর এবং নানা চড়াই উৎরাই সেখানে। সে তো তবু ভাগ্যবান, তমাল এইভাবে বোঝাল নিজেকে, তার লড়াইয়ে পাশে একজন রয়েছে, যে তমালের মতোই মনেপ্রাণে একজন শিল্পী। প্রকৃত সহযোদ্ধা বলতে যা বোঝায়, তাই।

শিল্পের তাড়না এবং খেয়েপরে বেঁচে থাকা এক জিনিস নয়। অল্প দিনের মধ্যেই তমাল বুঝতে পারল বাবার হুকুম মেনে সদর্পে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। শুধুমাত্র নাটক করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা যথার্থই কঠিন কাজ। হয়ত সে একা হলে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু তার আর বাবার মাঝখানে উঁচু পাঁচিল হয়ে দাঁড়াল তার স্ত্রী। মেয়েটি অল্প বয়সী হলে কি হবে! যেমন জেদী তেমনি অহংকারী। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর অজ্ঞাতে তমাল গোপনে মায়ের থেকে এবং বাবার পরিচিত স্নেহধন্য এমন কিছু মানুষের থেকে টাকা ধার, বাকিতে জিনিস আনা, এইসব শুরু করল। একসময় এটাও সে জানতে পারল, তার অপরিশোধ্য

ধারবাকি তার বাবা গোপনে শোধ করে দিচ্ছেন। তমাল ভাবল এটা তার বাবার পুত্রদৌর্বল্য বা ঐ জাতীয় কিছু। সে স্বস্তি পেল এবং আরও নতুন নতুন ধারের উৎস খুঁজে বার করল।

তমাল এবং তার স্ত্রী অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরীর তোড়জোড় শুরু করল। নিজেদের তারা শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র বা উৎপল দত্ত শোভা সেন গোত্রীয় ভেবে নিয়ে, বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন একটি বলিষ্ঠ জুড়ির সম্ভাবনা দেখতে পেল।

উদয়বাবুর পরিবর্তিত মনোভাব সম্পর্কে তারা কিছুই জানতে পারল না। আদিনাথকে উদয়বাবু ফাঁকা হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এ খবরটা তমাল এবং তার স্ত্রীর অজ্ঞাতেই রয়ে গেল।

তিন

আদিনাথ এমনিতে নিরীহ শান্ত শিষ্ট। ব্যবসা করতে গেলে পাঁচরকম খদ্দেরের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়। কারোর সঙ্গে কারোর মেলে না। আদিনাথ জানে ভালমন্দ সবাইকে নিয়েই চলতে হয়। কানা খোঁড়া পঙ্গু অথর্ব নয়, সুস্থ সবল একটা ছেলে বউকে সঙ্গে নিয়ে নাটক করে বেড়াবে, অথচ দেনা শোধ করবে না, এটা হজম করা শুধু অনুচিতই নয়, রীতিমত সামাজিক অপরাধ। এমনিতে আদিনাথ শনি মঙ্গলবারে পুজো দেওয়া ছাড়া, অন্য কোনভাবে পয়সা ব্যয় করে না। প্রাণ ধরে ভাল পোশাক পরা বা রিক্সায় চড়ে কোথাও যাওয়ার অভ্যাসও তার নেই।

আদিনাথ মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি থেকে মন খারাপ নিয়ে বেড়িয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল, যেখানে যে অবস্থায় তমালকে পাবে, সাপটে ধরবে। সরাসরি টাকা চাইবে। একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায়। মাস্টারমশাইয়ের ছেলে বলে সৌজন্যের যে পর্দাটুকু টাঙিয়েছিল, নিজেই সেটা ছিঁড়ে দেবে।

ব্যাপারটা কাকতালীয় না বলে বরং এইভাবে ধরা যাক, আদিনাথের সততার জয়। উদয়বাবুর কথা স্মরণে রেখে সে অটুট বিশ্বাসে তমালকে ধারবাকিতে জিনিস দিয়েছে! এর মধ্যে কোন দ্বিচারিতা নেই। আবার অনেকদিন পার হয়ে যাওয়ার পর লোকমুখে শুনে সে উদয়বাবুর কাছে গেছে প্রাপ্য টাকা চাইতে। এর মধ্যে পদ্ধতিগত এবং নীতিগত কোন ভুল নেই। অপারগ পুত্রের ঋণ সক্ষম পিতা শোধ করতেই পারেন।

মোড়ের মাথায় তমালকে দেখতে পেয়ে আদিনাথের তাই মনে হল, সে যে ঠিক পথে আছে, এটা তারই অকাট্য প্রমাণ। তা না হলে আজ তার দোকান বন্ধ। প্রতি সপ্তাহে দোকান বন্ধের দিনটিতে সে কলকাতায় মহাজনের গদীতে যায়। আজও যেত। হঠাৎ করে শরীরটায় কেমন ঝিমোনো ভাব ধরায় কলকাতা যাওয়া বাতিল করে দিল। খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ির লাগোয়া ধাপিতে বসে পথচলতি এর ওর তার সঙ্গে টুকটাক

কথাবার্তা হচ্ছিল আর ঘন ঘন হাই তুলছিল। আচমকা তার দৃষ্টি আটকে গেল, সামান্য দূরে মোড়ের মাথায় তমাল হাত পা নেড়ে কমবয়সী দুটি মেয়েকে কী সব বোঝাচ্ছে। মেয়ে দুটি নিশ্চয়ই কলেজে পড়ে। স্কুলের মেয়েদের মতো পোশাক নয়। একজনের পরণে আগুন রংয়ের শাড়ি। অন্যজন শালোয়ার কামিজ। মেয়ে দুটি তমালের মুখের পানে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। যেন তমাল যা বলছে, কান দিয়ে তারা তা শুনছে না। চোখ দিয়ে গিলছে।

আদিনাথ শান্ত স্বভাব এবং ভিতু প্রকৃতির হলে কি হবে, তমালকে দেখেই তার মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠল দপ করে। যে ছেলে বাবার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে, সে যে মাপেরই কেউকেটা হোক না কেন, আদিনাথের বিচারে ফেরেব্বাজ এবং শয়তানের শয়তান। আদিনাথের ইচ্ছে হল মেয়ে দুটির সামনেই তমালকে একটু পালিশ করে দেয়। তাতে সুবিধা এই যে অপমানটা তমালের বুকে একটু বেশি করে বিঁধবে। পরমুহূর্তেই মনে হল, তমালকে একা পেলেই, তর্জনগর্জন প্রয়োজনে হুমকি দেওয়াটা সহজ কাজ হবে। বলা যায় না, কথায় কথা বাড়তে বাড়তে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গিয়ে যদি হাতাহাতির উপক্রম হয়, দুটি কিশোরীর সামনে সেটা বেশি দূর এগোবে না। দেখাবেও খারাপ।

সামান্যক্ষণ পরে মেয়ে দুটি টা টা করতে করতে বিদায় নিল। তাদের চলার পথের দিকে একঠায় কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তমাল আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এবং আদিনাথের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। আশ্চর্য, তমালকে একটুও বিচলিত বা ভীত বলে মনে হল না। যেন সে সত্যি সত্যি আদিনাথকেই খুঁজছিল এমনি ব্যাগ্রতায় এগিয়ে এল, বিশ্বাস কর আদিদা, তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি!

আদিনাথ গায়ে জড়ানো গামছাটা খুলে কাঁধে রাখল। তারপর ধাপি থেকে টুক করে লাফিয়ে নেমে তমালের সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোয়াল শক্ত এবং দাঁত দিয়ে দাঁত ঘষার জন্য ঘসঘস জাতীয় মৃদু আওয়াজ হচ্ছিল। যা কেবলমাত্র সে নিজেই শুনতে পাচ্ছিল।

— দোকান বন্ধের দিন, কলকাতা যাওনি বুঝি? তমাল একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল।

মুখে কিছু না বলে আদিনাথ ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

— নতুন একটা নাটক নামাচ্ছি। তমালের গলায় আত্মতৃপ্তির সুর, শুনেছো নিশ্চয়ই? এবারও আদিনাথ কোন সাড়া না দিয়ে ঘাড় দোলাল, না।

— ফার্স্ট শো-টা ইচ্ছে আছে, রবীন্দ্রভবনে করবো। তমাল বলল, রিসেন্টলি ভাড়াটা এমন বাড়িয়ে দিয়েছে! ভাল টিকিট বিক্রি না হলে পরতায় আসবে না।

— হুঁ, বলে আদিনাথ ক্লান্তিতে আড়মোড়া ভাঙ্গার ভঙ্গি করে তমালকে নিজের

দেহের খাঁজভাঁজ দেখাল, কে তোমাব টিকিট কিনবে?

— কেন? তমাল বেশ অবাক বোধ করল, যারা নাটক ভালবাসে। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য দশ বিশ টাকা দিয়ে তারা টিকিট কাটবে না ভাবছ?

— আমার ভাবাভাবিতে কী এসে যায়! আদিনাথ বেশ রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, আমার মতো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ তো আর পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তোমার পালা দেখতে যাবে না।

— আরে দূর! তুমি টিকিট কাটবে কেন? তুমি হলে গিয়ে বাবার পুরনো প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন। বাবা প্রায়ই তোমার কথা বলে।

— চোপ! আদিনাথ আচমকা চীৎকার করে উঠল, আবার ফেরেব্বাজির কথা বলছ? আমি এইট অব্দি পড়েছি। তার মধ্যে তোমার বাবা অন্তত দিন পনের আমাকে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছে সাত আট দিন। গার্জেন কল করিয়েছে। একটু থেমে বলল, ইস্কুল থেকে আমার ট্যানেসপারের কাগজটা তোমার বাবা-ই নিজের হাতে আমায় ধরিয়েছিল। আব আজ তুমি বলছ, আমি তোমার বাবার প্রিয় ছাত্র?

— সে রকমই তো জানতাম। তমাল মিনমিন করে বলল।

— দ্যাখো বাপু! আদিনাথ চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে বলল, ওসব গল্পগাছা ছাড়। গত পরশুই তোমার বাবার কাছে গেছিলাম। মুখের ওপর স্রেফ বলে দিল, তোমার এক পয়সা দেনাও আর শোধ করবে না। তাতে পাওনাদারেরা তোমার গলার গামছা বেঁধে টানুক আর যাই করুক।

— তাই নাকি? তমাল চোখ নাচিয়ে নাটুকে গলায় বলল, তুমি মাইরি পারোও। সামান্য কটা টাকার জন্যে বাড়ি অব্দি ধাওয়া করলে?

— সামান্য টাকা! আদিনাথ সত্যি অবাক হয়ে গেল, কত টাকার ধার খেয়েছো খেয়াল আছে?

— অতশত হিসেব রাখি না। তমাল কাঁধ ঝাঁকাল, একটু আটকে পড়েছি তাই এত কথা বলছো। একটু থেমে বলল, নতুন নাটকটা জমে গেলে, যার যা ধার বাকি, এক হপ্তার মধ্যে ক্লিয়ার করে দোব।

— অন্যের কথা বাদ দাও, আদিনাথ গম্ভীর গলায় বলল, আমাবটা শোধ করছো কবে বল তো?

— বললাম তো! তমাল বেশ বিরক্তির সুরে বলল, নাটকটা জমতে দাও।

— যদি না জমে? আদিনাথ জেবা করার ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বলল, এখনও তো শুরুই হোল না।

— তুমি না আদিদা! মুখ দিয়ে আক্ষেপসূচক আওয়াজ করল তমাল, একি 'কালো বরের খোঁড়া বউ' নাকি 'বাসর ঘরে স্বামীব লাশ' — এই ধরণেব প্রোডাকশন, যে দুদিন

রিহার্সাল দিয়েই চোঙা ফুঁকতে শুরু করে দোব, শহর কাঁপাতে আসছে অমুক অভিনীত অশ্রুসজল পালা ...। চেয়ার দশ, জমি পাঁচ। একটু থেমে বেশ ভারিক্কী গলায় বলল, নাটক জিনিসটা এত সোজা নয় আদিদা। সে যেমন জীবনের কথা বলে, আবার আগামী দিনের পথ চলার আলোও দেখায়। একটা ভাল নাটক তৈরী করার জন্যে কী অপরিসীম ধৈর্য্য, পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের দরকার, তুমি ভাবতেই পারবে না। নবান্ন, রক্তকরবী, কল্লোল, অগ্নিদুপাস, ভাব তো এই নাটকগুলো এক একটা যুগ তৈরী করে গেছে! এই দ্যাখ, আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস কর, মনে হচ্ছে, দর্শকদের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তুমি আমায় নাটক নিয়ে প্রশ্ন করছ। আর আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে তার জবাব দিচ্ছি।

তমালের লম্বা কথনে সামান্য সময়ের জন্য হলেও আদিনাথ একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। ঠিক আত্মবিস্মৃতি নয়, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তার মনে হল, সত্যি যদি ভর দুপুরের এই ফাঁকা রাস্তাটা একটা রঙ্গমঞ্চ হোত এবং সে একজন দর্শক হিসাবে হল ভর্তি লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে কিছু প্রশ্ন করতে পারতো! সকলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখত। কেউ হয়ত চাপা গলায় বলে উঠত, মুদির দোকানী আদিনাথ তলেতলে এত খোঁজখবর রাখে?

দূর দূর! দু হাতে চোখ কচলে আদিনাথ দেখছে আজন্ম দেখা সেই রাস্তা। ধাপির কোণে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে ছানাপোনা সমেত মা-কুকুর। রাস্তার নিচু কলে জল পড়ছে ছরছর করে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে তমাল, তার দিকে সামান্য ঝুঁকে উদগ্রীব চোখে চেয়ে রয়েছে, যেন সত্যি সত্যি তাব থেকে কিছু শুনতে চাইছে।

আদিনাথ স্মরণ করতে পারছে কী কারণে সে ধাপি ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল। তমালেব থেকে পাওনা সাত আটশো টাকা এবং এ ব্যাপারে উদয় স্যারের 'না' জবাব তার মনে পড়ছে। এমনকি নাটক করে তা থেকে টাকা রোজগার করে তমাল যে কোনদিনই আদিনাথের পাওনা টাকা মেটাতে পারবে না, এটাও সে পরিষ্কাব বুঝতে পারছে।

কিন্তু তারপবেও আদিনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না, তমালের ঘোরলাগা দুটি চোখ, খাড়া হয়ে ওঠা গায়েব লোম। এমনকি তমালের গলার স্বরটাও যে একটু অন্যরকম, ঠিক ভাঙ্গা বা বসা নয়, ববং যেন আস্তো কান্নাব ছোঁয়া লেগে রয়েছে তাতে, আদিনাথের কানে তেমনই শোনাল।

আদিনাথ তমালেব পিঠে হাত বেখে কোনবকমে, আচ্ছা। ঠিক আছে। বলে পিছন ফিরল। এ কথার কোন মানে নেই সে জানে। কিন্তু সে-ই বা কী করবে? আবার তার দাঁতের ফাঁকে মাছের কাঁটা আটকেছে। নাটক নিয়ে তমাল যা বলল, আদিনাথ তার বেশিটাই বুঝতে পারেনি। যে সব নাটকের নাম বলল, তার কোনটির নামই সে শোনেনি। এটাও তার একটা খেদের জায়গা। খার্মতিব জায়গা।

তমাল বাউণ্ডুলে ফেরেব্বাজ যাই হোক না কেন, অনেক বিষয়েই আদিনাথের থেকে

বেশি জানে। আদিনাথের থেকে বেশি লোক চেনেও তাকে। আজ না হোক কাল পরশু তমাল হয়ত সত্যি সত্যি তারিফ পাবার মতো কিছু একটা করে বসবে।

সেটাই সত্যি হোক। আদিনাথ আপন মনে বলল। কারণ টাকা আদায়ের জন্য উদয় স্যারকে সে যে মিথ্যে করে বলেছে, তমাল আমাদের শহরের গৌরব।

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে আদিনাথের লজ্জা করতে লাগল। তাই সে পিছন ফিরে চলতে চলতেই অনুচ্চারিত গলায় বলল, অনেক বড় হও তমাল। জম্পেশ করে একখানা পালা নামাও তো দেখি। জীবনে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি। তার মধ্যে মাস্টারমশাইকে যে মিথ্যে কথা বলেছি তোমার সম্পর্কে, সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে, সত্যি কিছু করে তুমি আমাকে মিথ্যে বলার পাপটুকু থেকে রক্ষা করো।

আদিনাথ আগের মতো ধাপিতে এসে বসল। বেশ আয়েস করে। শরীর মনের ম্যাজম্যাজানিটুকু বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে। পুরনো একটা প্রেমের গান বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠছে —

তুমি রাজার বেশে
আসবে জেনে
দুয়ার খুলে
বসে আছি
পথের পানে চেয়ে।

নতুন লড়াই

এক

এ বছরে এখনও এনতাজ আলিকে কেউ দেখেনি এই অঞ্চলে। ফি বছর শীত শেষ হওয়ার আগেই এনতাজ আলির ডাক শোনা যায়, ছাতা সারাবেন গো? টুটাফুটা লেডিজ জেন্স ছাতা মেরামতি করাবেন গো?

এনতাজের পরণে ডোরাকাটা লুঙ্গি। গায়ে খয়েরী রংয়ের পাঞ্জাবী। সোনালী সুতোর কাজ করা, জ্যাবরা ধরণের। পাঞ্জাবীটা পুরোনো এবং সময়মতো কাচা হয় না বলে, রং চটে গেছে, কুঁচকে গেছে। মাপেও ছোট হয়ে গেছে। ঝুলে খাটো। গায়ে টানটান। এনতাজের কাছাকাছি এলে গা-গুলোনো গন্ধ লাগে নাকে। যদিও এনতাজ আতরে তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রাখে। চোখে সুরমা লাগায়। মাথায় তেল দেয় নিয়মিত। সেলাই করার ফাঁকে ফাঁকে মাথার তেলে সূচ ভিজিয়ে নেয়। এনতাজের পোশাকের মতো চেহারাটাও জৌলুসহীন। হাসিটাও সুন্দর নয়। হাসলে, আকারে বড়, ফাঁক ফাঁক আর পানের লাল ছোপে ঢাকা দাঁতগুলো বেআব্রু হয়ে যায়। তখন তার মুখের ছিটেফোঁটা কমনীয়তাটুকু ঢেকে গিয়ে, মুখখানাকে রীতিমত কুৎসিত দেখায়।

হরিপুর অঞ্চলের বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই জানে, এনতাজ আলি মানুষ হিসাবে সরলসাদা, অমায়িক। খদ্দেরকে ঠকানোর মতলব তার নেই। স্বজাতি তো বটেই, হিন্দুদের বাড়িতেও এনতাজের অবাধ যাতায়াত। তাদের উঠোনে, রোয়াকে বসে জলখাওয়া, চা মুড়ি খাওয়ার ব্যাপারে কোনরকমে অসুবিধে বা অস্বস্তি নেই এনতাজের।

এনতাজের বাড়ি হুগলী জেলার শেষ প্রান্তে। ফুরফুরা শরীফ পেবিয়ে যেতে হয়। অতদূর থেকে রোজ যাতায়াতেব খরচ আছে, তার ওপর সময়ও লেগে যায় অনেকক্ষণ। এনতাজ তাই, বসন্তের শুরু থেকে দুর্গাপুজোর মুখোমুখি, এই আট মাস, ভদ্রেশ্বরেব খানপুরে, গ্রাম সম্পর্কে খালাতো ভাই ইয়াকুবের বাড়িতে থাকে। সপ্তাহে একদিনের জন্য দেশের বাড়িতে যায়। ইয়াকুব সম্প্রতি বিয়ে কবেছে। এনতাজকে তাই ঘর ছেড়ে দাওয়ায় শুতে হয়। দাওযাব দড়িতে এনতাজেব পোশাক ঝোলে। বড় একটা চটেব ব্যাগেব মধ্যে কাজের সরঞ্জাম।

দাওয়ায় থাকা নিয়ে এনতাজের মনে কোন ক্ষোভ অভিমান নেই। ইয়াকুবের বউ যখন রাতেব খাবাব বেড়ে তাকে ডাকে, সামনে বসে থাকে ঠায়, যতক্ষণ না তার খাওযা শেষ হয়, জলেব ঘটি, দড়ি থেকে গামছা এগিয়ে দেয়, এনতাজের মনটা কানায় কানায়

ভরে ওঠে। তার মনেই হয় না, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথায় রয়েছে।

ইয়াকুব ভিক্টোরিয়া জুট মিলের কর্মী। তার মাসিক আয় এনতাজের চেয়ে অনেক বেশি। এনতাজকে সে নিজের দাদার মতোই ভালবাসে। খাইখরচ হিসাবে যা নেয়, চলতি বাজার রেট অনুযায়ী সেটাও অনেক কম। বিপদে আপদে এনতাজকে টাকা ধারও দেয়। ইয়াকুবদের পরিবারে এনতাজ যে একজন বাইরের মানুষ, এটা প্রতিবেশীদের অনেকেও জানে না।

কেবল একটা ব্যাপারে ইয়াকুবের সঙ্গে এনতাজের বিস্তর ফারাক। ইয়াকুব ধর্মপ্রাণ মুসলিম। সে প্রতিদিন কম করে তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। জুম্মাবারে মাথায় ফেজ টুপি চাপিয়ে মসজিদে যায়। স্বামী স্ত্রী দুজনে রোজা করে। সজ্ঞানে থুতু পর্যন্ত গেলে না।

এনতাজ অধার্মিক নয়। কিন্তু ধর্মীয় সব নিয়মকানুন মেনে চলতে পারে না। এরজন্য তার মনে কোন পাপবোধও জাগে না। উৎসবে সে ছেলেমেয়ে বিবির জন্য নতুন পোশাক কেনে। ফুরফুরা শরীফের মেলায় যায়। সিমাই কেনে। গোস্ত রুটিও খায়, কিন্তু নিয়মিত নামাজ পড়ে না। ইয়াকুবের মতো একমাস ধরে রোজা মানতেও পারে না।

ইয়াকুব যেমন তার বউকে একান্তে রীতিমত শাসিয়ে দিয়েছে, রোজার সময় আসমানে চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সে যেন এনতাজকে এক গ্লাস পানিও না দেয় নিজে হাতে, এনতাজও তেমনি, গল্পে মশগুল হয়ে ভুলেও কোনদিন বলে না যে সে হিন্দুর বাড়িতে বসে রুটি মুড়ি খায়। বীরেশ্বর দুবের দোকানের কচুরি জিলিপি না খেলে নিজেকে তার কেমন দুর্বল মনমরা মনে হয়। দুবেজীর দোকানে সুখদুঃখের গল্প কবার মতো কয়েকজন সঙ্গীও আছে তার। তারা কেউ-ই মুসলিম নয়। অথচ তাদের সঙ্গেই এনতাজ নিয়ম করে প্রতিদিন গল্প করে। এক আগুন থেকে বিড়ি ধবায়।

দুই

বীরেশ্বর দুবের দেশ বিহারের ছাপরা জেলায়। বীরেশ্বরের ঠাকুর্দা বিহার থেকে বাংলায় এসেছিল, তখন বাংলা ভাগ হয়নি। কলকাতা অখণ্ড ভারতের রাজধানী। ঝুটমুট কাজ দিয়ে জীবন শুরু করে, শেষ বয়সে মিষ্টির ব্যবসায় নেমেছিল। ঝাঁকাভর্তি নোনতা মিষ্টি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করে বেড়াত। ঠাকুর্দার পরে বীরেশ্বরের বাবা বাজারের মুখে ছোট একটি গুমটি ঘরে তেলেভাজা, তার সঙ্গে কচুরী সিঙ্গাবা জিলিপি দিয়ে স্থায়ী ব্যবসা শুরু করে।

বীরেশ্ববের জন্ম বাংলা মুলুকের এই শহরেই। সে পড়াশুনা শুরু করেছিল বাংলা মিডিয়াম স্কুলেই। বন্ধুবান্ধবও সব বাঙালী। বীরেশ্বব আজ পর্যন্ত বিহারে দেশের বাড়িতে যায়নি। তার বাবা বছরে দুবাব দেশে যেত। একবাব খেতেব ধান তোলাব সময়। আর অবশ্যই ছট পুজোর সময়।

বীরেশ্ববেব বাবা নিজেব জীবদ্দশাতেই দেশেব জমিজমা বিক্রি কবে দিয়ে, সেই

টাকায় 'দুবে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-র ভোলচাল পাল্টে জমকালো মিষ্টির দোকান তৈরি করেছে। নিজের বুদ্ধিতে, নিজের পরিশ্রমে। মধ্যবয়সী ধর্মপ্রাণ বিহারী ব্রাহ্মণটি কীভাবে যে বুঝেছিল, তার ছেলে বাংলা মুলুক ছেড়ে কোনদিন দেশমুখো হবে না।

স্কুলে ন'ক্লাস পর্যন্ত পড়ে বীরেশ্বর আর পড়াশুনো করল না। পরিবর্তে 'ফিজিকাল কালচার'-এ ভর্তি হয়ে মুঠো মুঠো ছোলা চিবিয়ে, ডাম্বেল ভেঁজে, ডন বৈঠক, প্যারালাল বারের কসরত করে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ট্রাইসেপ বাইসেপ ফুলিয়ে শরীর প্রদর্শনের বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করতে লাগল।

ছেলের পড়াশুনো না হওয়ার জন্য বা সকাল বিকাল ব্যায়াম করে শরীর স্বাস্থ্য বাড়ানোর জন্য, বীরেশ্বরের বাবার মনে কোনরকম খেদ বা হতাশা ছিল না। সে জানত, ব্যবসার ব্যাপারে ছেলে এখন যতটা উদাসীন, বিয়ের পরে এবং বিশেষ করে বাবার অবর্তমানে যখন সংসারের জোয়াল কাঁধে চেপে বসবে, তখন ব্যবসায় শুধু মাথা গলাবে না, রীতিমত ডুবে যাবে। মজে যাবে।

কেবল একটি বিষয়ে ধার্মিক মানুষটির ঘোরতর সন্দেহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকেই গেল, একমাত্র ছেলেটি অধার্মিক না হলেও, কোনরকম ধর্মীয় অনুশাসনের ধার ধারল না। গোপালজীর মন্দিরের চাতালে মাথা ঠেকাল না। গাল, তার সঙ্গে হাতের গোলাগুলি ফুলিয়ে বজরংবলীকে নিয়ে ক্যারিকেচার করল।

হরিপুর অঞ্চলে বীরেশ্বর যথেষ্ট জনপ্রিয়। তার কথাবার্তা, চালচলন, পোশাক সব কিছুই খাঁটি বাঙালীর মতো। পৈতৃক মিষ্টান্নের ব্যবসাটি সে এখন মন দিয়েই করে। কিন্তু টিপিক্যাল ব্যবসায়ী বলতে যা বোঝায়, তা সে নয়। তার দোকানে সব জাতের, সব শ্রেণীর মানুষের অবাধ যাতায়াত। ধারের খাতায় উকিল মাস্টার প্রফেসর থেকে শুরু করে কেরানী রিকসাওয়ালা মুটেমজুর কলেজ পড়ুয়া বেকার ছেলেমেয়ে, এমনকি ছাতা সারাইওলা এনতাজ আলির নামও আছে। প্রতিদিন রাত ন'টার পরে, টেবিল চেয়ার জুড়ে বিভিন্ন বয়সী মানুষ জমকালো আড্ডা জমায়। খেলাধূলা সিনেমা থেকে শুরু করে সামাজিক অব্যবস্থা, স্থানীয় সমস্যা, পুরসভার দুর্নীতি, এমনকি জাতীয় রাজনীতি নিয়েও তুমুল তর্কবিতর্ক হয়। অতিবাম, বাম, ডান সব ধরণের মানুষ নিজেদের বিশ্বাস এবং যুক্তি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াতর্ক করে।

বীরেশ্বর সব ধরণের আলোচনাতেই একটু আধটু মাথা গলায়, মন্তব্য করে, কেবল রাজনীতি বাদে। কারণ রাজনীতির ব্যাপারে তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সে মার্কস বা গান্ধী কারোর লেখাই পড়েনি। হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে ছিটেফোঁটাও জানে না।

তিন

পুরনো অসুখ নতুন করে চাগাড় দিয়ে ওঠার মতো, আচমকাই খাদ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা বাসস্থান, এইসব জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে ছাপিয়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

গুজরাটের গোধরা শহরে দপ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে তা বিস্ফোরণের চেহারা নিল সারা গুজরাট জুড়ে। সরকারী মদতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচার অত্যাচার চালানো হল। হাজারে হাজারে মানুষ গৃহহীন হল। আগুনে পুড়িয়ে, তরবারির কোপে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকশো কিশোরী যুবতী এবং বিবাহিতা মহিলাকে ধর্ষণ করা হল। সংসদে দাঁড়িয়ে একজন ধর্মান্ধ হিন্দু সাংসদ ঘোষণা করলেন, এদেশে সংখ্যালঘুদের বেঁচে থাকতে হবে, সংখ্যাগুরুদের অনুগ্রহে। প্রয়োজনে তাদের পদানত হয়ে।

গোধরা কাণ্ড এবং অশান্ত গুজরাটের ছবি প্রতিটি দৈনিক কাগজে ছাপা হতে লাগল। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে যে যার মতো করে গুজরাটের পক্ষে এবং বিপক্ষে তার সমর্থন এবং নিন্দা করল।

বীরেশ্বর লক্ষ্য করল তার দোকানে রাতের আড্ডায় খেলাধূলা সিনেমা স্থানীয় সমস্যাকে ছাপিয়ে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আলোচনার ঝড় বইতে শুরু করল। জাতপাতের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে প্রায় সবাই সরব। দুচারজন চুপ করে থাকে। বীরেশ্বর বুঝতে পারে নিশ্চুপ যারা, হয় তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বপক্ষে, তা না হলে, বিরোধী হলেও, এ জাতীয় আলোচনায় কোন উৎসাহ বোধ করে না।

আরও একটা বিষয় বীরেশ্বরের নজর এড়াল না। দোকানের পিছনে তার বাবার প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। অচেনা মুখের অনেক মহিলা তার দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙায় সন্দেশ ভরে গোপাল মন্দিরে পুজো দিচ্ছে।

চার

গুজরাটের ঢেউ এ রাজ্যে আছড়ে না পড়লেও, হিন্দু এবং মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক মানুষ ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

যেমন ইয়াকুব একদিন এনতাজ আলিকে ডেকে বলল, ভাইজান, সাবধানে ঘোরাফেরা করবে! দিনকাল ভাল নয়। গুনতিতে আমরা কম আছি। ওরা যদি অ্যাটাক করে, কেউ বাঁচব না।

এনতাজ একটু ঘাবড়ে গেল। মিনমিন করে বলল, তাহলে কী করব?

-- এলাকা বুঝে কাজ করবে। ইয়াকুব বলল, আমি তো ভাবছি, নাজমাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসব।

— তা কী করে হবে? এনতাজের গলায় অবাক ভাব, খানা পাকানো, ঘরের কাজ কাম ...!

— গুলি মারো শালে। এনতাজের কথার মধ্যেই ইয়াকুব গর্জে উঠল, আগে জান বাঁচাতে হবে। আমরা দুজনে বেরিয়ে গেলে, কোঠিতে নাজমা একা থাকে। একটু চুপ করে থেকে এনতাজের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, কারখানাতে

অনেক বাতচিত শুনি। সব ফালতু বাত নয়। মিল গেটের পাশে বজরংবলীর মন্দিরে রোজ মিটিং বসে। রাতেব বেলায়।

— তোর কথা ঠিক আছে। এনতাজ বলল, লেকিন আমি যে এরিয়ায় যাই, ওখানকার আদমিলোকের সঙ্গে আমার বহুত চিনা আছে। অনেক বছর পার হয়ে গেল তো!

— ঠিক আছে, ইয়াকুব রাগত গলায় হাত নেড়ে বলল, খোদা মেহেরবানি, তোমার কুছু না হোক। কিন্তু ঝামেলা পেকে গেলে আমার কোঠিতে আর ঢুকতে দোব না।

ইয়াকুবের শেষের কথাটায় প্রাণের ভয়ের চেয়েও, জায়গা না মেলার হুমকি এতটাই প্রকট হয়ে বাজল এনতাজের কানে, যে সে প্রিয় পুরনো অঞ্চল হরিপুর মুখো হওয়ার সাহস পেল না আর।

পাঁচ

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে কোথায় কোন দিকে যাবে ভাবতে ভাবতে, এনতাজ আলির হঠাৎই হরিপুরের কথা মনে পড়ে গেল। খুব কষ্ট হতে লাগল। কতদিন হবিপুরের মানুষজনকে দেখেনি সে। চেনা মুখগুলি মনে পড়তে পড়তে কয়েকটি মুখ কেমন আবছা হয়ে গেল। এনতাজ আলি লুঙ্গির খুঁটে চোখের জল মুছল। আপন মনে বিডবিড় করল, খোদাতাল্লা আসমান জমিনের মালিক। তার মতো একটা লোকেব জান বাঁচাবে না! বাঁচাবে। এনতাজ আলি বেশ শব্দ করে এমনভাবে বলল যেন তার মুখোমুখি বসে ইয়াকুব, কথার মারপ্যাঁচে যে এনতাজকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। বাঁচাবে। আলবাৎ বাঁচাবে। ওরা তো আমার ঠিকানা জানে না। তাই পাত্তা করতে পারছে না। ওদের সঙ্গে আমার কোন দুষমনি নেই। বেওকুফ ইয়াকুব। ঝুটমুট কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমার বিজনেসে লুকসান করাচ্ছে।

প্রতিদিনের মতোই এনতাজ আলি কাজের সরঞ্জাম ভরা চটের ব্যাগটি কাঁধে ফেলে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। একটা দুটো স্টপ বাদ দিয়ে, তৃতীয় স্টপেজ থেকে সে বাসে উঠবে। বলা তো যায় না, সামনের স্টপেজ থেকে তাকে বাসে উঠতে দেখে কেউ যদি ইয়াকুবকে বলে দেয়, অমুক নম্বব বাসে এনতাজ মিয়াকে উঠতে দেখলাম!

ছয়

এনতাজ আলি গলা ছেড়ে ডাকছে, ছাতা সারাবেন গো? টুটাফাটা লেডিজ জেন্স ছাতা মেরামতি করাবেন গো?

প্রথমে একটি দুটি, তারপর প্রায় সব বাড়ি থেকেই কেউ না কেউ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, সদব দরজা খুলে, এমনকি সাইকেল থামিয়ে দু'চারজন বাবুলোক একই কথা

বলতে লাগল, কোথায় ছিলে গো এতদিন? কী হয়েছিল তোমার?

এনতাজ জবাব দেবে কি, আনন্দে আবেগে তার গলা বুজে আসছে, দেশে গেছিলাম দিদিমুনি। বিবির অসুখ বাবুসাহেব। আপনারা সব ভাল আছেন তো? এনতাজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, বাড়ির মেয়ে বউরা বিস্মিত গলায় বলছে, লোকটা একটুও বদলায়নি। চেহারা, এমনকি মুখের হাসিটা অব্দি একই রকম আছে।

ছাতা সারাবেন গো? হাঁক পারার ফাঁকে ফাঁকেই এনতাজ এর ওর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, কুশল সংবাদ নিচ্ছে। হাত নেড়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করছে। যার অর্থ, মালিকের দয়ায় আমি ভাল আছি। আপনারাও ভাল থাকুন।

বড় বড় পা ফেলে এনতাজ হাঁটছে। সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে গোটা অঞ্চলটা প্রথমে এক চক্কর মেরে আসবে। তারপর যে যেমন ডাকবে সেইমত কাজ শুরু করবে। চৌরাস্তার মোড়ে এসে এনতাজ, ডাইনে না বাঁয়ে কোনদিকে যাবে, এটা ঠিক করতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে ভেবে নিয়ে সে যখন মাথা তুলে তাকাল, প্রথমেই তার চোখে পড়ল 'দুবে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। তার বুকের মধ্যে এক টুকরো আনন্দ তুরুক করে লাফিয়ে উঠল। ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারায় রাস্তা পারাপারের নির্দেশ দেওয়া মাত্রই, এনতাজ একরকম লাফ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপার থেকে এপারে এল।

অনেকদিন পরে 'দুবে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ এনতাজকে দেখে মালিক বীরেশ্বরের মতো কর্মচারী দুলাল, মহাদেব এমনকি খদ্দেরদের কেউ কেউ চমকে উঠল।

বীরেশ্বর বলল, কী ব্যাপার আলি ভাই? এতদিন আসোনি কেন? এনতাজ জবাব দেবে কি, কান্না ঠেলে উঠছে গলার কাছে। কোনরকমে বলল, শরীরের যুত ছিল না। রোদের মধ্যে ঘুরলে মাথার দরদ হচ্ছিল। আঁখে ঝাপসা লাগত।

— ডাক্তার দেখিয়েছ? কে যেন জিজ্ঞেস করল।

— হাঁ। হাঁ। এনতাজ দ্রুত জবাব দিল। তারপর সামনে, পিছনে মাথা ঘুরিয়ে যেন সকলের কথারই জবাব দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে নিজের কপালে হাত ছোঁয়াল, খোদার মেহেরবানি, আপনাদের আশীর্বাদে এখন ভালই আছি। আপনারা সব ভাল আছেন তো?

ঠিক আগেব মতোই এনতাজ কাঁধ থেকে কাজের সরঞ্জাম ভর্তি চটেব ব্যাগটি দোকানের এক কোণে রেখে, বেসিনের কল খুলে হাত ধুল। চোখেমুখে জল হাত বোলাল। কচুরি নিমকি, তার সঙ্গে একটা মিষ্টি খেয়ে পলিথিনের জগ থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। পাঞ্জাবীর হাতায় মুখ মুছে কাউন্টার গিয়ে দাঁড়াল, কত হল?

— এখনই দেবে? নাকি লিখে রাখব? মাথা না তুলেই বলল বীরেশ্বর।

— লিখে রাখবেন? এইটুকু বলতেই এনতাজের চোখ জলে ভবে গেল, তাহলে লিখেই রাখুন।

দোকান থেকে বেরিয়ে এনতাজ এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে ঘুরে কাজ করল সাবাদিন।

এতদিন না আসার কারণ জানতে চাইল যারা, তাদের কাউকে বলল, শরীরে অসুখ হয়েছিল। কাউকে বলল, দেশের বাড়িতে যেতে হয়েছিল, জমিজমার ঝামেলা সামলাতে। বামুন বুড়ি রাইদিদিকে বলল, মেয়ের সাদীর বন্দোবস্তে আটকে পড়েছিল।

রাইদিদি দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকাল, ভগমানের দয়ায় ভালভাবে কাজ উদ্ধার করো বাবা।

এনতাজের বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল, এতটা মিথ্যে কথা বলা ঠিক কাজ হল না। উপায়ই বা কী?

ইয়াকুবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে আসতে পারেনি, এই সত্যি কথাটা তো আর বলা যায় না। শুনলে হয়ত এদের চোখ কপালে উঠবে। জিভ কেটে বলবে, ছিঃ এনতাজ! এ কী বলছ! এতদিনে আমাদের সম্পর্কে তোমার এই ধারণা হল!

ইয়াকুবটা কোন খোঁজখবর রাখে না। কিচ্ছু জানে না। কোথায় কী হচ্ছে, এর তার মুখে সেইসব গল্প শুনে, তামাম দেশের সব জায়গাকে একরকম মনে করে! সব মানুষের মনেই বিষ আছে, পাপ আছে, ভেবে নেয়! বাড়ি ফিরে যখন সে তার আজকের অভিজ্ঞতার কথা বলবে, প্রথমে ইয়াকুব হয়ত হাত পা ছুঁড়ে ঝগড়াতর্ক করবে। তারপর যখন দেখবে তার ভাইজান সত্যি সত্যি আস্ত শরীরে ফিরে এসেছে, পাঞ্জাবীর পকেট উল্টে সারাদিনের কাজকামের মজুরীর টাকাপয়সা বার করে রাখছে দাওয়ার মেঝেতে, তখন নির্ঘাৎ ইয়াকুবের মিথ্যে ভুল ধারণাটুকু ভেঙ্গে যাবে। এখানকার মানুষজন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করবে।

সাত

রাতের বেলায় বাড়ি ফিরে এনতাজ, ইয়াকুবের নাম ধরে বারকয়েক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পেল না। হয়ত ইয়াকুব বাড়িতে নেই, নাজমা ঘরের মধ্যেই আছে, কিন্তু একান্ত আপন কোন কাজ করছে, এমনি ভেবে এনতাজ দাওয়ায় উঠে চটের ব্যাগটি মেঝেতে রেখে, ঘামে ভেজা পাঞ্জাবীটি দড়িতে মেলে দিল। দুপাশ থেকে লুঙ্গিটাকে সামান্য গুটিয়ে নিয়ে, ধপ করে দাওয়ার মেঝেতে বসে পড়ল। আপনা আপনিই একটা লম্বা শ্বাস বেড়িয়ে এল, ওফ্।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে এসেছিল এনতাজের। হঠাৎ কে যেন তার কানের কাছে মুখ এনে চীৎকার করে উঠল, কোথায় গেছিলে সারাদিন? কোন মুলুকে?

এনতাজ চমকে উঠে চোখ খুলে তাকাল। তার সামনে সটান দাঁড়িয়ে ইয়াকুব। রাগে উত্তেজনায় ইয়াকুবের জ্বলন্ত চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। ঝড়ে যেমন বড় বড় গাছ একটু একটু দোলে, ইয়াকুবের টান টান শরীরটাও তেমনি অল্প অল্প দুলছে।

এনতাজ যত না ভয় পেল, তার চেয়ে বেশী ঘাবড়ে গেল। জড়ানো গলায়

কোনরকমে বলল, কাজকামে গেছিলাম। একটু হেসে বলল, পুরনো মুলুকে গেছিলাম। সব কুছ আগের মতো ঠিক আছে।

— তো? স্থির চোখে এনতাজের মুখের পানে চেয়ে রয়েছে ইয়াকুব।

— এতদিন যাইনি কেন, সবলোক এইসব পুছল। কাজ কাম করলাম। পয়সা দিল। দুবেজী ওর দুকানে খাওয়াল। বাবু বিবি ছোটা বাচ্ছা সব হাসল, হাত নাড়ল, আউর ......।

— চোপ। চোপ সালে। ইয়াকুব ধমকে উঠল, কাফের, দুষমনদের সঙ্গে মস্তি মারাতে গেছ?

— ইয়াকুব! তু শোন, সাচ বাত বলছি।

— বাহার যাও। ইয়াকুব চীৎকার করে বলল, আমার কোঠিতে তোমাকে থাকতে দোব না। বেইমান।

কথা শেষ করেই ইয়াকুব মেঝেতে রাখা চটের ব্যাগ আর দড়িতে ঝোলানো পাঞ্জাবী টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠোনে। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে খুচরো পয়সা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাগ ফুঁড়ে কালো কাপড়ের টুকরো, ছাতার মাথার পলিথিনের টুপি কয়েকটি, তার সঙ্গে তিন চারটি স্টীলের স্টিক বেরিয়ে এল।

এনতাজ উঠে দাঁড়িয়ে কাতর চোখে এদিক ওদিক তাকাল। চোখের জল গাল বেয়ে চিবুক ছুঁয়ে মাটিতে পড়ছে।

— বেশরম আদমি! অধৈর্যে মাথা ঝাঁকাল ইয়াকুব, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

ইয়াকুবের দুচোখ লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে। বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে। নিঃশ্বাস ফেলছে ভোঁস ভোঁস শব্দ করে।

এনতাজের দৃষ্টিতে আবছা ধরা পড়ল নাজমার শাড়ির আঁচল। ঘরের মধ্যে থেকে মেয়েটা উঁকি মেরে দেখবার সাহসটুকুও পাচ্ছে না।

গুটি গুটি পায়ে এনতাজ দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নামল। ততক্ষণে আশপাশের ঘরগুলি থেকে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এসেছে। আশ্চর্য, তাদের কেউই সামনে এগিয়ে আসতে সাহস করছে না।

উবু হয়ে বসে এনতাজ খুচরো পয়সা, কাজের সরঞ্জাম এইসব কুড়োচ্ছে মাটি থেকে। মাথা না তুলে, ঘাড় না ঘুরিয়েও সে বুঝতে পারছে, তার চারপাশে মানুষের ভিড় বাড়ছে। বাতাসে থমথমে ভাব। নাক টানলে একটা অন্য রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ইয়াকুব আর চীৎকার করছে না। দাওয়ার সিঁড়িতে কোমরে হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন মহাদোষে দুষ্ট এনতাজকে হাতে নাতে ধরে ফেলে, মারধোর থানা পুলিশ এসব না করে, ভালয় ভালয় চলে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছে।

এনতাজ নতুন করে কথা শুরু করার মতো মনের জোর পাচ্ছে না। সে কিছু বলছে না বলেই হয়ত প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে খারাপ অনেক কিছু ভাবছে। এনতাজের মন খারাপ হয়ে গেল। বুকের ডান দিকে চিনচিনে একটু ব্যথাও অনুভব করল।

আট

মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনে ফিরছিলেন ছুটিপুর ইস্কুলের মাস্টারমশাই। আটান্ন নাকি থার্টি ইয়ারস সার্ভিস, হুইচ এভার ইজ আরলিয়ার, এইসব ভাবনায় মাস্টারমশাই একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। হঠাৎ করে জুট মিল লেবার কোয়ার্টারের সামনে কিছু মানুষের ভিড় দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মাস্টারমশাইকে দেখে ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন ছুটে এল, নিচু গলায় ফিসফিস করে তারা মাস্টারমশাইকে কী যেন সব বলল।

শুনে মাস্টারমশায়ের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি রাজনীতি করেন না। তাঁর কথামত কোন একজন তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলবে, এমনটা কখনই হবে না। মাস্টারমশায়ের নিজেকে খুব অসহায় এবং দুর্বল মনে হল। তিনি ধীর পায়ে ভিড়ের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

মাস্টারমশাই বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। বদলে যাওয়া সমাজের একটি ছবিও তিনি সযত্নে আগলে রেখেছেন বুকের মধ্যে। কিন্তু আজ তিনি এ কী দেখছেন? কী হতে চলেছে?

বাড়ির পথে চলতে চলতে মাস্টারমশাই নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। এ তো সম অসমেব লড়াই নয়। ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের বা শোষকের সঙ্গে শোষিতের লড়াই নয়।

এ এক সম্পূর্ণ নতুন লড়াই।

গরীবের সঙ্গে গরীবের লড়াই।

যখন বৃষ্টি

দরমা ঘেরা বারান্দায় শুয়ে বাবা দিনরাত কাশে। ঘঙ ঘঙ করে। মাঝে মাঝে গলার কাছে জড়ানো শ্লেষ্মা চৌকির নিচে রাখা মাটির সরায় ফেলে। ঘরের মেঝেতে হ্যারিকেনের স্বল্প আলোর ওপরে ঝুঁকে পড়ে দিদি রঙ্গিন কাগজের ফুলের মালা তৈরী করে। দেওয়ালে দিদির ছায়া পড়ে। কিম্ভূতাকার ছায়া। একহাত লম্বা এক ডজন মালা গাঁথতে পারলে দিদি ছ'টাকা পায়। একা হাতে কাগজ কেটে ফুল তৈরী করে মালা গাঁথতে অনেক সময় লাগে। দেড় ডজনের বেশী মালা গাঁথতে পারে না দিদি একদিনে। তার মানে ছয় দেড়ে ন'টাকা রোজগার একটানা আট ঘণ্টা কাজ করতে পারলে। দিদি আমার থেকে বছর চারেকের বড়। দিদির এখন তিরিশ কি একত্রিশ বছর বয়স। দেখায় কিন্তু চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশের মতো। একে দিদি রোগা, তার ওপর ঘাড় নিচু করে কাজ করার জন্য, ওর কোমরে পাকাপাকি একটা ব্যথা। দিদি সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। সামনে ঝুঁকে বয়স্ক মানুষদের মতো হাঁটে। দিদিব চোখে চশমা আছে। সস্তার কালো ফ্রেম। মাথার চুল উঠে যাওয়ার জন্য কপালটা চওড়া দেখায়। সিঁথিটাও সোজা নয়। সামান্য বাঁকা এবং বিধবা মহিলাদের মতো ফ্যাটফেটে সাদা। একমনে মালা গাঁথতে গাঁথতে কোন কারণে দিদি হঠাৎ করে মাথা তুলে তাকালে, দিদির মুখটা বিষণ্ণ, চিন্তিত এবং দুঃখী দুঃখী দেখায়। চশমার কাঁচ ভেদ করে যে চোখ দুটি দেখা যায়, তাতেও ক্লান্তির ছাপ। এমনিতে দিদি কথা কম বলে। চুপচাপ। কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। নিজের সম্পর্কে কোন অনুযোগ নেই। আমার প্রায়ই মনে হয়, আমাদের এই অভাব-সর্বস্ব ছিরিছাঁদহীন সংসারে দিদিকে বেশ মানিয়ে গেছে। দিদি যেন ধরেই নিয়েছে এভাবে টেনে হিঁচড়ে বেঁচে থাকাটাই তার নিয়তি। আর নিয়তিকে মেনে নেওয়াই স্বধর্ম পালনের মতো মহান কর্তব্য।

বাবার মিল বন্ধ হয়ে গেছে তিন বছরের ওপর। মিল বন্ধের কয়েকমাস আগে মা মাবা গেছে। মা না-থাকাটা দুঃখের। কিন্তু কেন জানি না, মা মারা যাওয়ার পর আমি তেমন শূন্যতা বোধ করিনি। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি মা অসুস্থ। কোনদিন শরীর মন একটু ভাল রইল তো সংসারের সামান্য কাজকর্ম করল। তা না হলে গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে রইল সারাদিন। দিনের পর দিন। দারুণ গরমেও মাকে দেখেছি গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে। মায়ের অসুখটা যে কী, ছোটবেলায় বুঝতাম না। রুগী মানুষ যন্ত্রণায় কাতরায় বা সামান্য সুস্থ বোধ করলে কথাবার্তা বলে। একটু হাসে টাসেও। মায়ের মুখে সবসময়েই নির্লিপ্তভাব। যেন এই পৃথিবীতে মা ভুলে করে এসে পড়েছে। আলো বাতাস গন্ধ মায়ের ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হয় না। খুশী হওয়া বা দুঃখ পাওয়ার

মতো অজস্র কারণের কোনটিই মাকে ছুঁতে পারে না। বড় হয়ে শুনেছিলাম আমার মা মনোরুগী। বিদেশে বা আমাদের দেশে ধনী পরিবারের কোন কোন পুরুষ মহিলার এই রোগ হয়। ভোগ্য বস্তুর চরম প্রাপ্তির পরে এ পৃথিবীর কোন কিছুই যখন আর মনকে টানে না, তখন অসীম শূন্যতা তৈরী হয়। তা থেকে নৈরাশ্যভাব জন্মায়। তখন কিছুই আর ভালো লাগে না। আমাদের মতো গরীব মানুষের ঘরে, যেখানে সাদামাটা চাওয়া পাওয়াটাও বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে, সেখানে আমার মায়ের মনোরোগ হয় কেমন করে, কে জানে! একেই বুঝি গরীবের ঘোড়ারোগ বলে!

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি দিদিই আমাদের সংসারের সব দিক আগলে রেখেছে। রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, তেলকালি মাখা বাবার মিলের পোশাক নিয়মিত সাবান দিয়ে কাচা থেকে শুরু করে, আমার পড়াশুনার তদারকি, মাকে সময়ে ওষুধ খাওয়ানো, দিদিই সব করে। ছোটবেলায় দিদিকে যত দেখতাম, অবাক হয়ে যেতাম। কোন মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক সামলে এত কাজ করতে পারে! দিদি যেন মা দুর্গার মতো। দু হাতের পরিবর্তে দশ হাতে কাজ করে। বড় হওয়ার পর অবশ্য এই মুগ্ধতার অনেকটাই কেটে গেছে। কারণ বাবার মিল বন্ধ হওয়ার পর কোয়ার্টার ছেড়ে এখন আমরা সস্তার ঘর ভাড়া করে যেখানে উঠে এসেছি, সেখানে আশেপাশে দিদির বয়সী অনেক মেয়েই আছে, তারাও একার ক্ষমতায় গোটা একটা সংসারকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাদের অনেকেই পেন ফ্যাক্টরিতে, প্লাসটিকের কারখানায় কাজ করে। এমনকি নিজেকে বিক্রি করেও সংসার চালাচ্ছে কেউ কেউ। মুখ বুজে।

বছর খানেক আগে যখন আমার বি. এ. পাশের খবর বেরোল এবং আমি বেশ ভাল নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম, সেদিন দিদির চোখে জল দেখে, আমার মনে হয়েছিল এটা কখনই আনন্দাশ্রু হতে পারে না। আমার জন্যে, বাবার জন্যে, মায়ের অসুস্থতার কারণে যে দিদি নিজে লেখাপড়া করতে পারল না, এ কান্নাটা সেই খেদের, অপূর্ণতার কান্না।

সত্যি বলতে কি সেদিনই প্রথম আমি মিহিরদার আমাদের বাড়িতে আসার ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পেরেছিলাম। মিহিরদা দোকানে দোকানে সস্তার বিস্কুট ডালমুট ঝুড়িভাজা, এইসব অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে। সকালে খবরের কাগজ ফেরি করে। লটারীর টিকিটও বিক্রি করে ঘুরে ঘুরে। পাপিয়া আমায় একদিন বলেছিল মিহিরদা সকালে খবরের কাগজ দিতে গিয়ে ওদের বাড়িতে চা চেয়ে খায় প্রায়ই। মিহিরদার ছোট বোন ঠোঁটে গাঢ় রং দিয়ে উঁচু হিলের জুতো পরে ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করতে করতে বারোটা পাঁচের গাড়িতে কলকাতায় যায়। শাড়িটা পরে নাভির নিচে। ব্লাউজটাও জ্যালজেলে। আমার বন্ধুরা মিহিরদাকে ঠিকমত না চিনলেও, তার বোনকে চেনে। পথেঘাটে দেখতে পেলে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, খেপ খাটতে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখবি কয়েক মাস পরেই 'সেবা ক্লিনিকে' যাবে। বিনা অস্ত্রোপচারে

মাত্র দশ মিনিটে ......! আমি কোন জবাব দিই না। কিন্তু রাতে ঘুম আসার আগে অব্দি বন্ধুদের খিক খিক হাসিটা কানে লেগে থাকে।

পাপিয়া আমার বান্ধবী। আমরা একসঙ্গে একই কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছি। পাপিয়া বি. এড. করছে, চন্দননগরে। এম. এ. পড়ার ইচ্ছে ছিল আমার। আমাদের সাংসারিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে শুধুমাত্র পড়াশুনার জন্য আরও দু আড়াই বছর নষ্ট করা, নিজেকে বেশ স্বার্থপরের মতো মনে হয়েছে। আমি আর পড়াশুনা করিনি। এখন আমি টিউশন করি। কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত করি। আমার টিউশনের টাকা আর দিদির মালা তৈরীর রোজগারে আমাদের সংসারটা কোনরকমে চলে। পাপিয়ার সঙ্গে সপ্তাহে দু দিন দেখা হয়। শনি আর রবিবার। আমি বুঝতে পারি, সপ্তাহের এই দুটি দিনের জন্য আমার যেমন আকুলতা আছে, পাপিয়ারও এই দুটি দিনের প্রতি মোহ আছে। যদিও আমরা পরস্পরকে 'তুই' 'তোকারি' করি, কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে বা হঠাৎ ছিটকে আসা কোন সংলাপে আমরা দুজনেই অপলক পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। নির্বাক হয়ে যাই। তখন পাপিয়ার নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। আমার মুখের মধ্যেটা শুকনো শুকনো লাগে। শ্বাস টানলে বুকটা কেমন ভারি ভারি মনে হয়। এই সব মুহূর্তে কী বলা উচিত বা কেমন আচরণ করলে পাপিয়া খুশি হয়, আমার প্রতি তার বিশ্বাস জন্মায়, আমি জানি। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন আমার রাশ টেনে ধরে। ঝুঁকে বসে হ্যারিকেনের আলোয় দিদি মালা গাঁথছে, কাশতে কাশতে বুক চেপে ধরে বাবা হাঁফাচ্ছে, দরমা ঘেরা বাথরুমে দিদি চান করতে ঢুকলে, কারা যেন ফোঁকরে চোখ রেখে ভেতরপানে দেখছে, এইরকম সব মন খারাপ করা ছবি দু চোখে এসে ভিড় করে। তখন পাপিয়ার চোখের থেকে আপনিই আমার চোখ মাটির দিকে নেমে আসে। পাপিয়ার মুখোমুখি বসতে আর একমুহূর্তও ভাল লাগে না। অস্ফুটে বলি, চল্। আজ উঠি।

আমার এমন ব্যবহারে পাপিয়া আহত হয় কিনা জানি না। ও কিন্তু বাধ্য মেয়ের মতো উঠে পড়ে। বড় জোর আব্দারের গলায় বলে, আমাকে একটু এগিয়ে দিবি না? আমার এই নিরুত্তাপ ব্যবহারে পাপিয়া আমাকে বোকা, কাপুরুষ ভাবতে পারে। যদি এর উল্টোটা হয়! আমাকে সংযমী, পরিশীলিত এবং রুচিবান বলে ভেবে থাকে! এ দুয়ের যাই হোক না কেন, আমি জানি, আপাতত আমি নিরুপায়। পাপিয়াদের পারিবারিক অবস্থা ভাল। কতটা ভাল জানি না। তবে আমাদের চেয়ে ভাল। ওর বাবা চাকরি করে। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের বাথরুমে শাওয়ার আছে। শাওয়ার থেকে ঝর্ণার মতো জল ঝরে পড়ে। ও তার নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করে।

মিহিরদা সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এই দুই ক্ষেত্রেই মিহিরদাদের অবস্থান যে নিচের দিকে, সেটি বুঝতে পারি। আমাদের অবস্থাও যেমন ভাল নয়, ভাল লাগার মতো শরীর স্বাস্থ্য বা দুর্লভ কোন গুণের অধিকারীও আমার দিদি নয়। এদিক থেকে বিচার করি যখন, তখন মনে হয়, মিহিরদার আমার দিদিকে ভাল

লাগবে, এটি দুয়ে দুয়ে চারের মতো নির্ভুল গাণিতিক সত্য। দিদির ভাল হোক, দিদি সুখী এটা আমি অন্তর থেকে চাই। মিহিরদার সাহচর্যে দিদি যদি আনন্দ পায়, বুক ভরে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে, একঘেয়ে কাজের মধ্যে দরজা খোলার খুট করে একটু আওয়াজ শোনার জন্য উৎকণ্ঠায় টানটান হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে লজিক্যালি আমার পছন্দ অপছন্দের যেমন কোন মূল্য নেই, পরিবারের একমাত্র শিক্ষিত অথচ বেকার ছেলে হিসেবে নিজের অক্ষমতাকে আড়াল করার কোন যুক্তিও নেই।

ইদানীং প্রায়ই ভাবি আমি যদি একটি চাকরি পেতাম, বাসা বদল করতাম। বাবার চিকিৎসা করাতাম। দিদিকে আর মালা গাঁথার কাজ করতে দিতাম না। নিজে বন্দোবস্ত করে দিদির বিয়ের ব্যবস্থা করতাম। লেখাপড়া শেখার এই এক বিড়ম্বনা। চট করে নিচে নামা যায় না। টিউশন করতে গিয়ে হাজার ইচ্ছে থাকলেও কোন ছাত্র বা ছাত্রীর মা পিসিকে ডেকে বলতে পারি না, আজ এক কাপ চা খাওয়াবেন তো। পাপিয়া বলে সকালে কাগজ দিতে গিয়ে মিহিরদা ওদের বাড়িতে চা চেয়ে খায় প্রায়ই। মিহিরদার বোনকে দেখলে বন্ধুরা বলে, কয়েকমাস পরে দেখবি, সেবা ক্লিনিকে ...... মাত্র দশ মিনিটে ......!

মিহিরদার সঙ্গে আমি পারতপক্ষে কথা বলি না। লোকটা বোকা না চতুর, জানি না। তবে বেসিক্যালি ভিতু। বাড়িতে আমি থাকলে, বাচ্ছারা যেমন আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে, সেইভাবে দেখে দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ আমার মুখোমুখি হয়ে গেলে চোখমুখ কুঁচকে এতটুকু হয়ে যায়। দিদির দিকে না তাকিয়েই 'আজ চলি' বা 'মেশোমশাই কেমন আছেন', এইরকম এলোমেলো সামঞ্জস্যহীন কিছু বলে দ্রুত ফিরে যায়।

এই সময় দিদির মুখের অভিব্যক্তি কেমন হয়, আমি দেখিনি। মিহিরদার অসহায় অবস্থা দেখে, দিদির চোখ কি জলে ভরে যায়? নাকি আমার প্রতি রাগ এবং অসন্তোষে দিদির দু চোখে রক্ত চলকে ওঠে? একবার দুবার নয়, বেশ কয়েকবার এইরকম অপ্রীতিকর অবস্থায় আমি কোনরকমে চটি পায়ে গলিয়ে একরকম ছুটে বেড়িয়ে গেছি বাড়ি থেকে। মিহিরদার কথা ভেবে নয়, দিদিকে আমি ভালবাসি বলেই, লজ্জাজনক পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র আঁচও যেন ও না পায়, বা বুঝতে পারে, এই ভেবেই দ্রুত বেড়িয়ে গেছি।

স্টেশন রোডের বৈদ্যর দোকানে পাপিয়া একটি চিরকুট রেখে গেছে আমায় দেবার জন্য। ছোট খামের মধ্যে চিরকুটটি ভরা। পিন দিয়ে মুখ আটকানো। দোকানের বাইরে এসে খাম খুললাম। সংক্ষিপ্ত লেখা। আজ বিকালে যেন অবশ্যই স্ট্যান্ডে গঙ্গার ঘাটে ওর সঙ্গে দেখা করি। জরুরী কথা আছে। আজ শনি বা রবিবার নয়। মঙ্গলবার। আর এভাবে চিঠি লিখে পাপিয়া কোনদিন দেখা করার কথা বলেনি। স্বভাবতই সারাটা দিন ভীষণ অন্যমনস্কতার মধ্যে রইলাম। পাপিয়ার কি কোন বিপদ হয়েছে? যার জন্যে ও কেবল আমারই সাহায্য বা পরামর্শ চায়? নাকি কয়েকটি শব্দের ধাঁধায় ফেলে, ও যাচাই করতে চায়, ওর ডাকে আমি সত্যি সত্যি সাড়া দিই কিনা! পাপিয়াকে কোনদিনই আমার

জটিল বা সত্যাসত্য বাজিয়ে দেখার মতো চতুর বলে মনে হয়নি। তাহলে এমন উৎকণ্ঠায় ভরা সংক্ষিপ্ত চিঠিটি ও রেখে গেল কেন, বৈদ্যর দোকানে! বৈদ্যর দোকানে আমি প্রতিদিন যাই সেটা ও জানে। কিন্তু আমার সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারটা, এইভাবে পিন আঁটা খামে ভরা চিঠির মধ্যে দিয়ে অন্যের কৌতূহল এবং ইঙ্গিতের বিষয় হয়ে উঠুক, নিশ্চয়ই ও চায় না। তারপরেও ......! চিঠিটি নিয়ে এটা সেটা ভাবতে ভাবতে একসময় আমার নিজেরই হাসি পেল। সত্যি যদি পাপিয়ার কোন বিপদ হয়ে থাকে, আমি কি পারি ওকে কোনরকম সাহায্য করতে! পরামর্শই বা কী দিতে পারি! আর আকুলতা, ওর তরফে তা সে যত নিবিড়ই হোক না কেন, আমার অবস্থা তো দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া মানুষের মতো। এমন অবস্থায় নাকি কোন কোন মানুষ জেদী, অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। আমি জানি, আমি সেইসব মানুষদের মধ্যে পড়ি না।

চিঠির নির্দেশমত আমি বিকালে স্ট্যান্ডে গঙ্গার ঘাটে হাজির হলাম। পাপিয়া এল সামান্য পরেই। আমার দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, সত্যি, তুমি এলে তা হলে! পাপিয়ার প্রশ্নের মধ্যে আমার মনে হল যেন শ্লেষের ছোঁয়া রয়েছে। নিজেকে কোনমতেই ধরে রাখতে পারলাম না। কঠিন গলায় বললাম, ডেকেছো তো তুমিই। একটু থেমে বললাম, তোমার কী সব জরুরী কথা আছে। পাপিয়া ঘাড় নেড়ে অস্ফুটে বলল, হ্যাঁ। খুবই জরুরী কথা।

শনি, রবিবারে যেভাবে পাশাপাশি বসি, আজ মঙ্গলবারেও সেইভাবেই বসলাম। চা-ওলাকে ডেকে চা খেলাম মাটির ভাঁড়ে। গভীর গোপন কোন কথা, অথচ বলতে সংকোচ হচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে পাপিয়া দু হাঁটু জড়ো করে তার ওপর নিজের লাবণ্যময়ী মুখটি রেখে অনুচ্চ গলায় থেমে থেমে প্রথমে, 'জানো', 'বলছিলাম কি', 'মানে তোমাদের' কয়েকবার এই শব্দগুলি উচ্চারণ করল। পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো একঘেয়ে, বিরক্তিকর। আমি অধৈর্যের গলায় বললাম, কী হয়েছে বলবে তো? পাপিয়া অযথাই মাটিতে নখের আঁচড় টানল কয়েকবার। তাবপর নিরুপায় ব্যক্তি যেমন অমোঘ দুর্যোগ ঘটতে পারে জেনেও চরম সত্যটি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে, ঠিক সেইভাবে বলল, তোমাদের মিহিরদা তোমার রেফারেন্স দিয়ে বাবার কাছ থেকে চারশো টাকা ধাব নিয়ে গেছে আজ সকালে। একটু থেমে বলল, কী লজ্জার ব্যাপার বল তো!

হঠাৎ ছিটকে আসা কোন কোন সংলাপে, এব আগে আমবা দুজনেই নির্বাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি। পাপিয়ার নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমার মুখের মধ্যে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আজ আমরা কেউ কারোর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। লজ্জা আমার। লজ্জা পাপিয়ারও। নীল আকাশেব বুক চিবে হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে অতিবড় সাবধানী মানুষও হকচকিয়ে যায়। আমার অবস্থাও সেইরকমই। কোনরকমে বললাম, চল। আজ উঠি। আজ আমরা দুজনেই পবস্পবকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলাম। অন্যদিনের মতো পাপিয়া একটু এগিয়ে দেওযার কথা বলল না। মাত্র দশটা কি বাবোটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে অনেকটা সময় লেগে গেল। তারপর

বড় রাস্তায় পা রেখেই অপরিচিতের মতো দুজনে দুমুখো হাঁটতে শুরু করলাম। রাগ বিদ্বেষ লজ্জা অপমান মিলেমিশে শরীরের মধ্যে অদ্ভুত রকমের অস্থিরতা শুরু হল। স্ট্যান্ডের ভেপার আলোগুলিকে মরা মাছের চোখের মতো ফ্যাকাসে লাগতে লাগল। এ ঘটনাটির কথা কাউকে বলা যায় কিনা বা নিজে এর মোকাবিলা করব কেমনভাবে, এ দুয়ের টানাপোড়েনে নিজেকে অসহায় নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। হাতের চেটো ঘামছে। পায়ের তলা ঘামছে। চটি পরা পা পিছলে যাচ্ছে বারবার। জ্বরে বেহুঁশ এমন একজন মানুষের মতো অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

সদরের ভাঙ্গা টিনের দরজাটা সরিয়ে বাড়ি ঢুকতেই দিদির গলা পেলাম। দিদি হাসছে। চাপা গলায় হাসছে। কিন্তু হাসিতে খুশির ছোঁয়া রয়েছে। দিদিকে কোনদিন হাসতে শুনিনি। অনেকক্ষণ পরে যেন এই প্রথম সম্বিত ফিরে পেলাম, কেন আমি বাড়ি ফিরে এলাম। সাবধানী মানুষের মতো পা টিপে টিপে দরমা ঘেরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঘরের মধ্যে একজন পুরুষ চাপা হিসহিসে গলায় বলছে, আয়নায় দেখো, শাড়িটা তোমায় দারুণ মানিয়েছে।

পুরুষ গলাটি আমার চেনা। রাগে সারা শরীর দপদপিয়ে উঠল। বারান্দা ছেড়ে এক ঝটকায় ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়ালাম। আশ্চর্য, দিদি বা মিহিরদা দুজনের কেউ-ই আমার উপস্থিতি টের পেল না। মিহিরদা শাড়ির আঁচল দিদির মাথায় আস্তে করে তুলে দিয়ে মিনতিভরা গলায় বলছে, আয়নায় একবার নিজেকে দেখো। তোমাকে ঠিক বউ বউ দেখাচ্ছে।

ব্রীড়াবতী নারীর মতো দিদি বারবার ঘাড় নাড়ছে। হাসছে। অস্ফুট গলায় বলছে, না, না।

হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় শাড়িটার রং বুঝতে পারছি না। দিদিকে কেমন দেখাচ্ছে, তাও বুঝতে পারছি না। কেবল আমার বিষণ্ণ বিমর্ষ দিদির খুশী খুশী ভাবটা সারা ঘর জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, ফুলের রেণুর মতো। আর মিহিরদা যেন সেই রেণুর ঘোরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বর-বউ খেলায় মেতে উঠেছে। আচমকা ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে দিদি ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ডানহাতের করতলে নিজের মুখ চেপে ধরে হাসি থামাতে গেল, ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠল, অরুণ, তুই ......!

আমি স্পষ্ট দেখলাম, দিদির দু চোখ ফুঁড়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে নেমে এল, গাল বেয়ে। একটি ফোঁটা দিদির চিবুকে আস্তো দুলতে লাগল। মুক্তোর দানার মতো জলের সেই ফোঁটাটি।

চোখের জলের এমন সুচারু, যথাযথ অবস্থান কদাচিৎ দেখা যায়। একেই বুঝি বলে আনন্দাশ্রু। আমার চিরদুঃখী দিদি, আমার হারিয়ে যাওয়া মা, আনন্দে কাঁদছে।

এ বড় দুর্লভ মুহূর্ত। সচরাচর দেখা যায় না। খুব কম জনেরই সৌভাগ্য হয় এমন মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকার। বেশ সহজভাবে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে, আমি একটু ঘুরে আসছি, বলে পিছন ফিরলাম। গলাটাকে আরও একটু চড়িয়ে বললাম, মিহিরদা, চলে যাবেন না কিন্তু।

বিহঙ্গ

গতকাল সন্ধ্যায় ইন্দিরা এসেছিল। আমি তখনও কলেজ থেকে ফিরিনি। সীমা ইন্দিরাকে বসতে বলেছিল। ইন্দিবা রাজি হয়নি। এমনকি এক কাপ চা-ও খায়নি। ও নাকি ভীষণ ক্লান্ত ছিল। তার ওপর ওর বাবার শরীরও ভাল নয়। ফেরার পথে বাবার জন্য ওষুধ কিনে নিয়ে যাবে। সঙ্গে গৃহস্থালীর টুকিটাকি কিছু জিনিসও। রাতে খেতে বসে সীমা যখন আমায় এইসব বলছিল, আমি কোনও মন্তব্য করিনি। আমি জানি আমাকে দেখতে না পেয়ে ইন্দিরা আর অপেক্ষা করতে রাজী হয়নি। ব্যাপারটা সীমা ধরতে পেরেছে কিনা, সেটা ওর কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় না। বরং সীমা যখন বলল, ইন্দিরাকে দেখলে সত্যি কষ্ট হয়। একা মানুষ কতদিক সামলাতে হয়। তার ওপর মনের দিক থেকেও খুব নিঃসঙ্গ কিনা! আমি খুব সাবধানে সীমার চোখমুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। সেখানে অন্য কোনরকম ইঙ্গিত বা সংকেত আছে কিনা।

আমি নিজে একটি কোএড কলেজে পড়াই বলেই, ছেলে এবং মেয়ের কথাবার্তার ধাঁচ, শৈলীসাপেক্ষে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য, এসব বেশ বুঝতে পারি। তারপরেও যে কোন কোন সময় আমার ধারণা ভুল হয় না, এমন নয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যে বলে গেছেন, নারী সমুদ্রের চেয়েও গভীর, গহিন অরণ্যের চেয়েও দুর্ভেদ্য, তা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। যেদিন ইন্দিরা আসে, রাতে খেতে বসে প্রয়োজনীয় সব কথা বাদ দিয়ে সীমা কেবল ইন্দিরার কথাই বলে। আর এমনভাবে বলে যেন ইন্দিরার দুঃখ কষ্টে ও নিজেও কষ্ট পায়। জানি না এটা সীমার কোনরকম চালাকি কিনা! ও হয়ত আমাকে বাজিয়ে দেখতে চায়। ইন্দিরার কথায় আমি খাওয়া থামিয়ে দিই কিনা বা অন্যমনস্কের মতো হয়ে যায় কিনা আমার চোখের চাউনি। কিম্বা উত্তেজনায় আমার কপালে, নাকের পাটায় এবং চিবুকে ঘামের দানা ফুটে ওঠে কিনা, সন্তর্পণে এইসব লক্ষ্য করে।

ইন্দিরা আমার বন্ধু অজয়ের বান্ধবী। কলেজ জীবনে আমি এবং অজয় একই রাজনীতি করতাম। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মতভেদ হয় আমাদের মধ্যে। তা সত্ত্বেও বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি এতটুকু। অজয় এখন বাংলার বাইরে অন্য একটি প্রদেশে, খতমপন্থায় বিশ্বাসী একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের হোলটাইমার। অজয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও ইন্দিরা এখনও অজয়কেই ভালবাসে। উভয়ের দাম্পত্য জীবন যে একটি অলীক কল্পনামাত্র, এটা বোঝার পরেও অজয়ের প্রতি ইন্দিরার কোনরকম ক্ষোভ অভিযোগ বা অভিমান নেই। ভালবাসার এমন বিশ্বস্ততা খুবই দুর্লভ। দুষ্প্রাপ্য। এই একটি ক্ষেত্রে আমি হীনম্মন্যতা বোধ করি। অজয়ের সৌভাগ্যের কথা ভেবে।

অন্যথায় আমি সুচাকুরে। আমার স্ত্রী, সোমা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী। গুছিয়ে সংসার করবে বলে চাকরির সুযোগ পেয়ে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দিয়েছে। আমার ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই শান্ত এবং মেধাবী। সাংসারিক কোন বিষয়ে এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে আমাকে বিন্দুমাত্র নজর দিতে হয় না। সোমা একা মানুষ দশহাতে দুর্গাপ্রতিমার মতো সব কিছু সামলায়। শহরের অভিজাত এলাকায় সম্প্রতি আমি একটি ছিমছাম বাড়িও করেছি। সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায় আমি সেইরকম একটি পরিমণ্ডলে বাস করি। সমাজে আমার সুপরিচিতি আছে। পথেঘাটে অনেক বয়স্ক মানুষও আমায় 'স্যার' বা 'প্রফেসর সেন' বলে ডাকেন। তাতে আমি যথেষ্ট গর্ব বোধ করি। তারপরেও কোন কোন রাতে যখন ঘুম আসে না, বিছানা থেকে নেমে সিগারেট ধরিয়ে খোলা জানলা দিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকাই, হয়ত তখন আকাশের বুকে ছেঁড়া কানির মতো এক টুকরো চাঁদ, ভাসমান হাল্কা মেঘের আড়ালে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাচ্ছে, রাতচরা কোন পাখি ডাকছে কুব্ কুব্ করে, আমার বুক খালি করে লম্বা শ্বাস বেড়িয়ে আসে। মনে হয় সবই পেয়েছি, সব আছে, তবু কী যেন একটা নেই। কিসের যেন অভাব, অপ্রাপ্তি। তখনই অজয় এবং ইন্দিরার কথা মনে পড়ে। সোমাকে আমি যে সম্পদ এবং প্রাচুর্যের মধ্যে রেখেছি, যে নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে আগলে রেখেছি প্রতি মুহূর্তে, ইন্দিরা এর কণামাত্র পায়নি অজয়ের থেকে। তারপরেও অজয়ের প্রতি ইন্দিরার এমন নির্মোহ স্বার্থহীন ভালবাসা আমায় ঈর্ষান্বিত করে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় আমায় দেখতে না পেয়ে সোমা রীতিমত আঁতকে ওঠে। বাচ্ছা মেয়েরা যেমন আচমকা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে, বিছানার চারপাশ হাতড়ে কানের দুল বা নাকছাবি খোঁজে, সেইরকম বালিশ উল্টে, চাদর ঝেড়ে, মশারির গায়ে চাপড় মেরে আমায় খোঁজে। তারপর হঠাৎ হয়ত চোখ পড়ে ঘরের জানলায়। কান্নাভেজা গলায় ডাকে, কী হল? ওখানে কী করছ?

আমি যদি বলি, কিছু নয়। ঘুম আসছে না তাই ......!

আমার কথায় সোমা আশ্বস্ত হতে পারে না। মশারি ফুঁড়ে নেমে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, সত্যি করে বল না, কী হয়েছে তোমার? সোমার দুচোখে জল টলটল করে। কথা বলে কাঁপা কাঁপা গলায়। সোমা অসহায় বোধ করছে, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, আমি বেশ বুঝতে পারি। এও বুঝতে পারি মাঝরাতে সোমার এমন আচরণে, কথাবার্তায় কোন ছল নেই। অর্থাৎ সোমা আমায় সত্যি সত্যি ভালবাসে। আমার ওপর ওর নিখাদ নির্ভরশীলতা। তারপরেও সব কিছু বুঝেও, সোমার অমন অসহায় করুণ চোখ দুটির দিকে চেয়েও আমার মনে হয়, সোমা কখনই ইন্দিরার মতো স্বার্থশূন্য প্রেমিকা হতে পারে না। অজয় এবং ইন্দিরার ভালবাসা প্লেটোনিক ভালবাসা। সুগন্ধী ফুলেব মতো যার সৌরভ। যার মধ্যে জাগতিক লাভক্ষতির সম্পর্ক নেই। আমার আর্থিক অবস্থা যদি যথেষ্ট ভাল এবং স্থিতিশীল না হোত, আমার মধ্যে সামান্য অসঙ্গতি লক্ষ্য করে সোমা কি এমন ব্যাকুল

হয়ে পড়ত! বা মশারি ফুঁড়ে নেমে এসে এমন নিবিড়ভাবে আমাকে জাপটে ধরত!

এসব কথা সোমাকে বলা যায় না। অতি প্রিয়জন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই মনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে। থেকে যায় আজীবন। মাঝে মাঝে মনে হয় পূর্ণতার পাশাপাশি এই খেদটুকু যেন সোনাতে খাদ মেশানোর মতো। ব্যবহারিক জীবন এতে শক্তপোক্ত হয়।

অজয় চিঠি পাঠায় ইন্দিরাকে। অজয়ের চিঠি ডাকে আসে না। এর ওর তার হাতফেরতা হয়ে সে চিঠি আসে আমার কলেজের ঠিকানায়। মুখবন্ধ খামের ওপরে প্রেরকের ঠিকানা থাকে না। ফলে অজয় এখন ঠিক কোথায় আছে আমি জানি না। প্রথম চিঠিটি যেটি সে আমায় পাঠিয়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল ওর কর্মাঞ্চল উড়িষ্যা অন্ধ্রের সীমান্তবর্তী এলাকা। চিঠিটি ছিল আদ্যন্ত রাজনৈতিক বক্তব্যে ভরা। ঠিক যেন পার্টির খসড়া।

শেষে বিঃ দ্রঃ দিয়ে লিখেছিল, তোর কলেজের ঠিকানায় চিঠি যাবে। আমাদের পার্টির বিশ্বস্ত ছেলের মারফত। এবার থেকে প্রতিটি চিঠি তোর কাছ থেকে ইন্দিরা এসে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ পরবর্তী চিঠিগুলি ইন্দিরাকে লেখা। জানি নি, মুখবন্ধ খামে ইন্দিরার উদ্দেশে অজয় যে চিঠিগুলি পাঠায়, তাতে রাজনীতির বাইরে অন্য কোন কথা লেখে কিনা! ইন্দিরা খুব নিস্পৃহ মুখে আমার কাছ থেকে অজয়ের চিঠিটি নিয়ে নিজের হাত ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে। পরপর পাঁচবারই ইন্দিরার একইরকম আচরণ দেখেছি। অজয়ের চিঠির জন্য নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে ব্যাকুলতা আছে। কিন্তু ওর চোখমুখে তার কোনরকম অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে না। জানি না অজয়ের চিঠিতে সেইরকম নির্দেশ ইন্দিরাকে দেওয়া থাকে কিনা! আমি তো বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি, অতি সামান্য কোন ব্যাপারকে 'ভীষণ গোপনীয়' এইরকম একটি মোড়কে ভরে সাসপেন্স তৈরী করতে অজয় ভালবাসত। পথঘাট নিরুপদ্রব জেনেও অজয় আমার বাড়িতে আসত এ গলি সে গলি ঘুরে ঘুরে। সন্ধ্যার পরিবর্তে অনাবশ্যক রাত এগারটা বা তারপরে এসে আমার ঘরের জানলায় টোকা মারত। তিনবার টোকা দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানানোর গোপন সংকেত ও-ই আমায় শিখিয়েছিল। তারপরে হয়ত নিতান্তই তুচ্ছ নিরীহ একটি ঘটনাকে চোখ বড় বড় করে হাত পা নেড়ে আমায় দুবার তিনবার সব কিছু বলে, গায়ের চাদরে মুখ ঢেকে টুক করে চলে যেত। আমায় বলে যেত, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে কারোর কাছে ফাঁস করবি না। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র।

রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে ওর সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়তে বাড়তে, একটা পরিষ্কার মেরুকরণ হয়ে গেল যখন, তারপর থেকে ও আমার সঙ্গে রাজনীতির বিষয়ে একটুও আলোচনা করত না। বরং তখন ও এমনসব কথাবার্তা বলত যা শুনে মনে হোত ও আদ্যিকালের বদ্যি বুড়োটি এবং সেকেলে সংস্কারে ঘোরতর আবদ্ধ। তখন ওর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সেকাল একালের সামাজিক রুচির ফারাক, বাজারদরের আকাশ পাতাল হেরফের, বড়জোর ভাড়া বাড়ি নিজের বাড়ির সুবিধা অসুবিধা — এইসব।

তারপর হুট করে একদিন বেপাত্তা। ওর বাড়ির লোক ভাবল, নিশ্চয়ই চাকরি বাকরির

ব্যাপারে ও কোথাও গেছে। বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে মাইনের টাকা, তার সঙ্গে একটি চিঠি খামে ভরে পাঠাবে। বাড়ির সবাইকে অবাক করে দেবে। সেসময় আমি অজয়ের বাড়ি গেলে ওর মা কান্নাকাটি করত। অজয়ের বাবা শেখরবাবু মনের দিক থেকে বেশ স্টেডি। বলতেন, যাবে আর কোথায়? নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করেছে কিছু। দূরে গেলে পাছে মা বাধা দেয়, এই জন্যেই পাঁচকান হওয়ার ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি। আমরা বন্ধুরাও সেইরকমই ভাবতাম। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হোত, রাজনীতিতে ওর মোহভঙ্গ হয়েছে। মনের দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। তারপরে যেটা স্বাভাবিক, তাই হয়েছে ওর ক্ষেত্রেও। বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই চাকরি বা অন্য কোন ব্যবসা করে মোটামুটি স্থিতাবস্থায় এসেছে। কারোর কারোর আবার বিয়েও হয়ে গেছে। রাজনীতি করার জন্য অজয়ের পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। দুতিনবার হাজত বাস করে পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেছে। এই অবস্থায় এখানে চাকরি যোগাড় করা বা ব্যবসা করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের থেকে লোন পাওয়া, দুটোই ওর ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক। তাই এই রাজ্যের বাইরে অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে নিজের রাজনৈতিক কার্যকলাপ গোপন রেখে, হয় চাকরি করছে বা অন্য কিছু, যেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বা ছোটখাট কোন ব্যবসা করছে। আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে যারা ওর বিপরীতে ছিলাম, প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম, এক্সট্রিমিস্ট হয়ে গিয়ে অজয় নিজের কেরিয়ারটা নষ্ট করল। আমি জানি অজয়ের সঙ্গে একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল এমন কয়েকজন এখনও এ শহরে আছে। তাদের কেউ গোপনে মুচলেকা দিয়ে কেসপত্র খারিজ করেছে। কেউ আবার জমির দালালি বা পুরনো বাড়ি কেনাবেচার কাজ করে ফুলেফেঁপে উঠেছে। সরকারী চাকরি পেয়ে দুচারজন অফিসে শাসক দলের রাজনীতি করে। আর কবে পুলিশের লাঠি খেয়েছিল, কয়েকদিনের জন্য হাজত বাস করেছিল, সেই পুরনো ঘিয়ের গন্ধ শোঁকায় তাদের বউ ছেলেমেয়ে, অকর্মণ্য শালা বা যুবতী শালীকে।

আমি নিজে অধ্যাপক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। মিটিং, ডেপুটেশন, রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করি। তারপরেও যেটা সত্যি, নিজের কাছে লুকোতে গেলে ভাবের ঘরে চুরি হয়ে যাবে, আমি জানি আমার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আছে। অস্তিত্বের গ্যারান্টি আছে। অজয়ের এর কোনটাই নেই। যদিও আমি এর জন্য রাজনীতিগতভাবে অজয়কে আমার চেয়ে মহান আদর্শবাদী বা সঠিক রাজনীতিবিদ বলে মনে করি না। মত এবং পথের ফারাক থাকলেও, আমি বিশ্বাস করি, আমরা দুজনেই শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখি। সর্বহারার একনায়কত্বে বিশ্বাস করি। সেটা সংসদীয় পথে নাকি বন্দুকের নলের মধ্যে দিয়ে আসবে, ভবিষ্যত সে কথা বলবে। অজয় হয়ত আমাকে সংশোধনবাদী সুবিধাবাদী ভাবতে পারে। যেমন আমি মনে করি ও হটকারী এবং মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন।

তাবপরেও আমরা দুজনে দুজনার ভাল বন্ধু। আমি যেমন প্রতি মুহূর্তে কামনা করি ও ভাল থাকুক, ও-ও নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে একইরকম চায়। ইন্দিরাকে লেখা চিঠি

ও যেমন বিশ্বাস করে আমার ঠিকানায় পাঠায়, আমিও তেমনি নিপুণ সতর্কতায় ওর চিঠি ইন্দিরার হাতে তুলে দিই।

ইন্দিরা একটি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। ও কিন্তু কোনদিনই রাজনীতি করে না। অজয় ইন্দিরার বাবার ছাত্র ছিল। সেই সূত্রেই দুজনের আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। অজয় আমি যখন একই রাজনৈতিক দলে ছিলাম, তখন আমরা দুজনেই চেষ্টা করেছিলাম, ইন্দিরাকে আমাদের দলে সামিল করতে। স্মিত হেসে ইন্দিরা তার অসম্মতি জানিয়েছিল আমাকে। আর অজয়কে সরাসরি 'না' বলে দিয়েছিল। আমার আত্মসম্মানে লেগেছিল। অজয় 'না' শোনার পরও নাছোড়বান্দার মতো ইন্দিরাকে সমাজ সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সমাজ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা, এইসব বুঝিয়েছে। রুশ এবং চীন বিপ্লবের কাহিনী শুনিয়েছে। ইন্দিবা চুপ করে শুনেছে। কোনরকম মন্তব্য করেনি। বড় জোর মাটির দিকে নামানো মাথা তুলে মাঝে মাঝে অপলক চেয়ে থেকেছে অজয়ের মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য।

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, অজয়ের জায়গায় যদি আমি থাকতাম, অবধারিতভাবে আমি ইন্দিরাকে অহংকারী ভাবতাম। তা না হলে ব্লান্ট। ইন্দিরার প্রতি আমার আকর্ষণ কমে যেত। অবিশ্বাস আসত। আস্তে আস্তে মোহশূন্য হয়ে পড়তাম।

আশ্চর্য, ইন্দিরার এই নিস্পৃহতা এবং অবজ্ঞাতে অজয় এতটুকু আহত হোত না। শ্লাঘায় লাগত না ওর। ইন্দিরা নিজেও কোনদিন অজয়কে রাজনীতি থেকে সবে আসার কথা বলেনি। মুখবন্ধ খামে ভরা অজয়ের চিঠিটুকুই এখন ইন্দিরার একমাত্র অবলম্বন। চিঠিটুকুর মাধ্যমেই অজয়ের সান্নিধ্য পাওয়া। এতে ও বেশ তৃপ্তও মনে হয়। তা না হলে চিঠির খোঁজে আমার কাছে ছুটে আসবেই বা কেন!

অজয়ের চিঠি ইন্দিরা আমার বাড়ি এসে নিয়ে যায়। হয়ত কোনদিন পুরনো কোন প্রসঙ্গ তুলে অজয়ের কথা বলতে যাই, মুহূর্তে ইন্দিরা নিস্পৃহ গলায় বলে, এটা তো আমি জানি বা এ বিষয়টা নিয়ে তো আগেও একদিন বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারি, হয় অজয়ের আলোচনায় ইন্দিরা কষ্ট পায়, বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে, তা না হলে আমার এই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষাকে ইন্দিরা কোনমতেই মন থেকে মেনে নিতে পারে না। বিশেষত যখনই তার মনে হয়, অজয় এবং আমি একই রাজনৈতিক মঞ্চে ছিলাম, তখনই সে অজয়ের তুলনায় আমাকে সুবিধাবাদী, এসকেপিস্ট এইরকম কিছু ভাবে। সোমার সঙ্গেও ইন্দিরা কথা বলে। নিতান্তই ক্যাজুয়াল কথাবার্তা। এক এক দিন মনে হয় গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ইন্দিরাকে বলি, অজয়কে তুমি আমার চেয়ে কম চেনো। হয়ত দেখবে যে কোনদিন ও সব ছেড়েছুড়ে গলায় কণ্ঠী পরে ফিরে আসবে। তারপব বিয়ে থাওয়া করে ঘোরতর সংসারী হবে। মাঝে মাঝে সোমা বলে, অজয়ের ব্যাপারে ইন্দিরার চাপা অহংকাব আছে। অজয় যেন মাও সে তুঙ, চে গুয়েভাবা কিম্বা হো চি মিন। সোমার এ ধরণের মন্তব্যে আমি কোন সাড়া দিই না। কিন্তু মনে মনে

ভাবি নেহাত ভুল বলেনি। খুঁত ধরার ব্যাপারে মেয়েরা পারদর্শী হলেও, এ ক্ষেত্রে সোমার প্রেডিকসনে কোন ভুল নেই।

এত সবের পরেও ইন্দিরা যেমন, আমিও তেমনি অজয়ের চিঠির প্রতীক্ষায় থাকি। অজয় চিঠি লেখে ইন্দিরাকে। আমাকে নয়। চিঠিতে সে আমার প্রসঙ্গে কিছু লেখে কিনা, তাও জানি না। তবু অজয়ের চিঠি এলে কেমন যেন নিশ্চিন্ত বোধ করি। প্রবাসী ছেলেমেয়ের চিঠি পেলে বৃদ্ধ বাবার যে রকম অনুভূতি হয়, আমারও সেই একইরকম অনুভূতি হয়।

গতকাল ইন্দিরা আমার বাড়িতে এসেছিল নিশ্চয়ই অজয়ের চিঠির খোঁজে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। রাতে শুয়ে হঠাৎই মনে হল, ইন্দিরা এসেছিল চিঠির খোঁজে নাকি অন্য কোন কারণে? মাত্র মাসখানেক আগে অজয়ের চিঠি এসেছে। আপাতত বেশ কিছুদিন অজয়ের চিঠি আসার কথা নয়। কারণ গড়পড়তা খান পাঁচ ছয় চিঠি পাঠায় সে বছরে। যে কোন ব্যাপারে মনের মধ্যে সামান্য খটকা তৈরী হলে, ঘুম চটে যায়। বিছানা থেকে নেমে সিগারেট ধরিয়ে বন্ধ জানলার একটি পাল্লা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, অসময়ে ইন্দিরার আসার কারণ কী হতে পারে! সোমা নিশ্চয়ই জেগে ছিল। অন্যদিনের মতো ভয়চকিত গলার পরিবর্তে আজ বেশ রুক্ষ্ম গলায় ডাকল, জানলাটা বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়। ছাইপাঁশ যা ভাবার কাল সকালে ভেবো। সারাদিন আমায় যথেষ্ট খাটতে হয়। এ সব জ্বালাতন ভাল লাগে না।

সোমা যেন আমার দিদিমণি। আমি বাধ্য ছাত্রের মতো আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে জানলা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এলাম। তারপরেও অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে ওই একই বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু একবারও সোমাকে সাহস করে বলতে পারলাম না, অসময়ে ইন্দিরার আসার কারণ বৃত্তান্ত, এইসব নিয়ে ভাবছি। এ ভাবনার সঙ্গে আমার প্রিয়জন অজয় সম্পর্কিত।

দিন চারেক পরে একদিন কলেজে অফ পিরিয়ডে টিচার্স রুমে বসে গল্প করছি, বেয়ারা এসে জানাল, একজন ভদ্রমহিলা আমার খোঁজ করছেন। জমিয়ে গল্প হচ্ছিল। স্বভাবতই বিরক্ত বোধ করলাম।

টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম, কলেজের গেটের কাছে একজন মহিলা উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেয়ারা ইশারায় দেখাল, উনিই আপনাকে খুঁজছেন। দূর থেকে বুঝতে পারিনি। কাছে গিয়ে দেখলাম, ইন্দিরা। যদিও সে তখনও উল্টোমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে।

— কী ব্যাপার, তুমি? বলে আমি আমার উপস্থিতি জানান দিলাম। চকিতে ইন্দিরা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল। তারপর নিচু গলায় থেমে থেমে বলল, কয়েকদিন আগে আপনার বাড়ি গেছিলাম।

— সে তো জানি। তুমি কী সব কেনাকাটি করবে বলে, অপেক্ষা করতে পারোনি।

ইন্দিরা ঘাড় নেড়ে আমার কথা সমর্থন করল। তারপর কোনরকম ভূমিকা না করেই

সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ওর কোন চিঠি পেয়েছেন?

— চিঠি? আমি সত্যি বেশ অবাক হলাম, এই তো মাসখানেক আগে চিঠি পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ......!

— না ... মানে ...! ইন্দিরা আমার কথা শেষ করতে দিল না। যদিও ওর নিজের গলাই যেন হঠাৎ করে জড়িয়ে যাচ্ছে, দিন কয়েক আগে কাগজে দুটো খবর ছাপা হয়েছে কিনা!

— খবর! এইটুকু বলেই আমায় চুপ করে যেতে হল। কারণ সকালবেলায় কলেজে আসার আগে বাড়ির বিভিন্ন কাজে আমি এত ব্যস্ত হয়ে থাকি যে দৈনিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইনগুলি ছাড়া অন্য কিছু পড়া হয়ে ওঠে না। কাগজ পড়ি আমি রাতের বেলায়। খাওয়াদাওয়ার পর। তাও নিয়মিত নয়।

— কী খবর? আমি জানতে চাইলাম। আর এই প্রশ্নটুকু করামাত্রই আমি বেশ বুঝতে পারলাম ঠাণ্ডা একটি স্রোত আমার বুকের ওপর থেকে নিচ বরাবর যেন গড়িয়ে নেমে গেল। খবরটা নিশ্চয়ই অজয় সম্পর্কিত এবং অবশ্যই ভয়ংকর দুঃসংবাদ ছাড়া সেটা অন্য কিছু নয়। আর সেইজন্যই ইন্দিরাকে এমন নার্ভাস দেখাচ্ছে।

— তুমি পড়েছ? আমি কোনরকমে বললাম।

— হুঁ। ইন্দিরা অস্ফুটে বলল। তারপর অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে করে বলল, পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে ছজন এক্সট্রিমিস্ট মারা গেছে। আর! বলে আঙুলে শাড়ির কোন জড়াতে জড়াতে অন্যমনস্কের ভঙ্গিতে বলল, আগামী ২৬শে জানুয়ারী এ. পি. চীফ মিনিস্টারের কাছে কয়েকজন এক্সট্রিমিস্ট আত্মসমর্পণ করবে। সি. এম. তাদের চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাতে তারা অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানের মূল জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

দুটি খবর এত পরস্পরবিরোধী যে ইন্দিরার মনে একইসঙ্গে দুঃখ ভয় অথবা আনন্দ স্বস্তি, দুই-ই জেগে থাকতে পারে।

আমি বললাম, তুমি খারাপটাই বা অ্যাপ্রিহেন্ড করছ কেন?

— না, না। তা কেন! দুটোই তো সত্যি হতে পারে না। এর যে কোন একটা সত্যি।

ইন্দিরা আর দাঁড়াল না। আমাকে 'যাচ্ছি' বা 'চলি' কিছুই না বলে সটান হাঁটতে শুরু করল। উৎসুক ছাত্রছাত্রীদের সামনে একটি অবিবাহিত মেয়েকে 'কী হল' বা 'দাঁড়াও না', হাত তুলে এই সামান্য কটি কথা বলতে আমার কেমন সংকোচ হল। ইন্দিরা যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, সেইভাবেই চলে গেল।

আর আশ্চর্য, এর পরদিনই অজয়ের একটি চিঠি কলেজে আমার হাতে দিয়ে গেল অল্প পরিচিত একটি ছেলে। ছেলেটি এর আগে মাত্র একবারই অজয়ের চিঠি আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। আমি ছেলেটির নামধাম ঠাঁইঠিকানা কিছুই জানি না। 'দূত অবধ্য' এমনি ভঙ্গিতে আমার হাতে মুখবন্ধ চিঠিটি দিয়েই কোনদিকে না তাকিয়ে

ছেলেটি হনহন করে চলে গেল।

প্রতিবারের মতো এবারেও খামের ওপরে বড় হাতের অক্ষরে ইংরাজীতে আমার নাম এবং কলেজের ঠিকানা লেখা। পোস্টাফিসের কোন স্ট্যাম্প নেই। প্রেরকের ঠিকানা এবং কোনও তারিখও লেখা নেই। চিঠিটি সাবধানে জামার বুক পকেটে রাখলাম। তারপর কোনদিন যা করি না, আজ তাই করলাম। চামড়ার হাত ব্যাগের মধ্যে চিঠিটি ভবে, ব্যাগটি হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলাম।

অন্যদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে বইপাড়ায় কিছুটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরি। আজ কিন্তু সরাসরি বাড়ি ফিরে এলাম। মনের ভুলেই হবে হয়ত, ব্যাগটিকে অন্য দিনের চেয়ে ভারি লাগছিল। কিছু কাগজপত্র, দুটি মাঝারি দামের পেন এবং কলেজ আলমারির একটি চাবি ছাড়া, আজ অতিরিক্ত যেটি আছে, তা হল মুখবন্ধ খামে ভরা একটি চিঠি। যার খোঁজে গতকাল ইন্দিরা আমার কলেজে এসেছিল। কলেজে ইন্দিরার উপস্থিতির ব্যাপারে সোমাকে কিছু বললাম না। আমার বিশ্বাস আজ কালের মধ্যেই ইন্দিরা আমার বাড়িতে আসবে। দৈনিক কাগজের পরস্পরবিরোধী খবর দুটি পড়ে ইন্দিরা অবশ্যই মানসিক দোলাচলে রয়েছে।

আমাকে সকাল করে বাড়ি ফিরতে দেখে সোমা বেশ অবাক হল, কী ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি? শরীর খারাপ নাকি? সোমার প্রশ্নের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরিবর্তে চাপা শ্লেষের ছোঁয়া। সোমার অভিব্যক্তিটুকু আন্দাজ করতে পেরেও আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইন্দিরা এসেছিল?

— ইন্দিরা? বলে সোমা অল্প একটু হাসল, সেদিন দেখা হয়নি বলে মন খারাপ? একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, আজ আসবে বুঝি?

আমি বেশ বুঝতে পারি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের অভিসন্ধিমূলক যে কোন প্রশ্নের জবাব আমি যত স্মার্টলি দিই না কেন, সোমার সঙ্গে কথা বলার সময়, বিশেষ করে যখন অমূলক সন্দেহজনিত কুশ্রী ইঙ্গিতের আভাস পাই, আমি কেমন দিশেহারা হয়ে যাই। রাগে নাকি ঘেন্নায়, কে জানে কথার খেই হারিয়ে ফেলি। এমনকি অনেক সময়েই উপযুক্ত একটি প্রতিশব্দও খুঁজে পাই না।

আজই প্রথম আমি সপাটে ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, হোল্ড ইওর টাং। তুমি তোমার লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

আমার এমন জবাব সোমার কাছে এতটাই অপ্রত্যাশিত যে সে বেশ ঘাবড়ে গেল, না। মানে ....! আমি তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি।

আমি ব্যাগ থেকে মুখবন্ধ খামটি বার করলাম, এটা অজয়ের চিঠি। জানি না চিঠিটা কবে লেখা হয়েছে! আদৌ ও নিজে লিখেছে নাকি অন্য কোন কমরেড ......!

— হতেই পারে। আমি বললাম, এনকাউন্টারে ও যদি মারা গিয়ে থাকে, অন্য কোন কমরেড সেই খবরটা ইন্দিরাকে লিখে জানিয়েছে।

— অজয়দা মারা গেছে? সোমা দু হাতের করতলে নিজের মুখ ঢেকে এলোমেলো মাথা নাড়তে লাগল, না, না, তা কী করে হবে?

সোমার পিঠে আস্তো হাত রেখে বললাম, কাঁদছ কেন? এত ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই। এর উল্টোটাও হতে পারে।

সোমা তার জলেভেজা দু চোখে অপলক আমার মুখের পানে চাইল, তার মানে!

— আত্মসমর্পণও করে থাকতে পারে। সরকার চাকরি দেবে।

— তুমি দুরকম কথা বলছ কেন? ঘোরলাগা বিস্ময়ের সুর সোমার গলায়।

— দুটো খবরই কাগজে আছে। আমি বললাম, মৃত্যু এবং আত্মসমর্পণ।

— আমি কি চাই জানো? উত্তেজনায় সোমার গলার শিরা ফুলে উঠেছে। চোখদুটি গোল গোল আর বড় বড় দেখাচ্ছে, অজয়দা ওসব ছেড়েছুড়ে ফিরে আসুক। ইন্দিরাকে বিয়ে করে সংসার করুক। বেচারী মেয়েটা একা একা সারাটা জীবন ......! সোমা এমনভাবে বলল যেন 'মৃত্যু' এবং 'আত্মসমর্পণ'-এর মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে হবে অজয়কে এবং সোমাই সেটা ঠিক করে দেবে। নিজের অজান্তেই বুক খালি করে শ্বাস উঠে এল। আমার মতো সোমাও চায়, অজয় বেঁচে থাকুক। ফিরে আসুক। ইন্দিরাকে নিয়ে সংসারের ঘেরাটোপে থিতু হয়ে বসুক।

সন্ধ্যার পরে পরেই ইন্দিরা এল। মনে হয় স্কুল থেকে বাড়ি যায়নি। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। পরণের শাড়িটিও সামান্য অবিন্যস্ত। আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেই হয়ত ইন্দিরা স্কুল ছুটির পরে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। চটিতে এবং পায়ের পাতায় ধুলো জমে রয়েছে।

— কী হল? ইন্দিরাকে ডাকলাম, ভেতরে এসো।

— ভেতরে যেতেই হবে? ইন্দিরা হাসবার চেষ্টা করল, আমার পায়ে যথেষ্ট ধুলো। আপনার এমন সাজানো গোছানো ঘরে ......!

ইন্দিরার গলা শুনে সোমা দ্রুত ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইন্দিরার দিকে তাকিয়েই সোমার নিজের চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ধরা গলায় কোনরকমে বলল, ভেতরে এসে বসো। আমি চা করে আনছি।

আমি একটি বেতের গোল চেয়ারে। আর আমার মুখোমুখি সোফায় ইন্দিরা। মাথাটি সামান্য ঝুঁকিয়ে কোলের ওপর দুহাত আলগা করে ফেলে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমার হাতে মুখবন্ধ খামটি। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না কখন এবং কীভাবে খামটি ইন্দিরার হাতে তুলে দেব।

সোমা চা করে নিয়ে এল। ইন্দিরা বাধ্য মেয়েটি হয়ে সোমার নির্দেশমত চা খেল। অস্ফুটে আমাকে বলল, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ঘরে আমরা তিনজন মানুষ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছি। অথচ কেউ কোন কথা বলছি না। এ ঘরে পুরনো আমলের একটি দেওয়াল ঘড়ি থাকলে ভাল হোত।

অবিরত টক টক শব্দে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হোত।

নীরেট নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ইন্দিরা হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল এবং বেশ সহজভাবেই আমার দিকে নিজের হাতটি বাড়িয়ে ধরল, চিঠিটা দিন।

প্রতিবারের মতোই কাঁধ ব্যাগের চেন খুলে চিঠিটি ব্যাগের মধ্যে রাখল। তারপর সোমার দিকে চেয়ে বলল, আজ আসছি।

সোমা যেন এই ঘরটিতে নিজের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে অন্য কোন ভাবনার জগতে ছিল এতক্ষণ। ইন্দিরার গলার আওয়াজে চকিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে কেমন বোকার মতো ইন্দিরার মুখের পানে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর হঠাৎই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, চল আমি তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। বলে সে সত্যি সত্যি ইন্দিরার হাতটি ধরল।

ইন্দিরা হেসে বলল, আমি কি ছেলেমানুষ! একটু থেমে বলল, আপনারা যা ভাবছেন তা কিন্তু নয়।

ইন্দিরার মুখ থেকে এইটুকু শোনার জন্যই যেন আমি আর সোমা অনন্তকাল অপেক্ষা করে রয়েছি। সোমা ব্যাগ্র গলায় বলল, আমার মন বলছে চিঠিটাতে খারাপ কোন খবর নেই।

চটিতে পা গলাতে গলাতে ইন্দিরা ঘাড় কাত করে হাসল।

— প্রশ্নটাতো আইদার অর? আমি অধ্যাপকীয় ভঙ্গিতে বললাম, আমার ধারণা অজয় এই দুয়ের তালিকার কোনটাতেই নেই।

ইন্দিরা ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল দরজার কাছাকাছি। তারপর শরীর ঘুরিয়ে, সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে আমার আর সোমার দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বলল, প্রশ্নটা আইদার অর নয়, দীপংকরদা। অজয়ের মৃত্যু কিম্বা আত্মসমর্পণ, আমার কাছে দুটোই সমান। বিশ্বাস করুন দুটোই সমান কষ্টের।

আমাদের বাড়ির সামনে ছোট একটি বাগান আছে। বাগানে অনেকরকম ফুল আছে। সোমা খুব ফুল ভালবাসে। নিয়মিত গাছের পরিচর্যা করে। বাগানটির জন্য আমার বাড়িটাকে বেশী সুন্দর দেখতে লাগে। ফুল বাগানের মাঝ বরাবর লাল মাটির সরু একটি পথ আছে। এই পথটির জন্য বাগানটিকে কখনো কখনো আমার নিজেরই অচেনা অনৈসর্গিক মনে হয়।

লাল মাটির সরু পথটি ধরে ছোট ছোট পা ফেলে ইন্দিরা লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আর সোমা ঘরের মধ্যে যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই স্থির দাঁড়িয়ে। ইন্দিরা কিন্তু স্বচ্ছন্দেই হেঁটে যাচ্ছে। আমরা দুজনে ওর চলার পথের দিকে চেয়ে রয়েছি। ও কিন্তু একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না।

লোহার গেট বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম বেশ স্পষ্ট করে। দুজনেই।

অস্তরাগ

এক

এখন তো যেমন খুশি শর্তে আর্টিস্ট ভাড়া করা যায়। তারা জিজ্ঞেস করে না কেমন রোল, অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা কে কেমন! পালাটি সামাজিক না পৌরাণিক, কিছুই জানতে চায় না। অভিনয় যে একটা শিল্প, এর মাধ্যমে মানুষের মনোরঞ্জন হয়, লোকশিক্ষা হয়, এখনকার শিল্পীরা সেসব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না। অভিনয় এখন শুধুমাত্র অর্থ রোজগারের জন্য। নতুন কিছু করব, করে দেখাব, শ্রোতারা বলে উঠবে, বাঃ! বৃষ্টির মতো ক্ল্যাপিং পড়বে। দূর দূর। যেন নিজেকেই নিজে ভর্ৎসনা করছেন, এমনি ভঙ্গিতে চোখমুখ কুঁচকে মাথা দোলালেন নব হালদার, ভাল করে রিহার্সাল অব্দি দেয় না। স্টেজে ওঠার আগেই অ্যাডভান্স নিচ্ছে। অথচ আমাদের সময়ে!

— একটু শর্ট করুন। নব হালদারের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল উদ্যোক্তাদের একজন।

আয়োজকদের অনুরোধ এবং শ্রোতাদের বিরক্তি দুই-ই শুনতে পেলেন নব হালদার। চমকে উঠে বড় বড় চোখ করে সামনে তাকালেন। অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ হলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। সাদা একটি মোটরগাড়িকে ঘিরে উৎসুক একদল মানুষ। গাড়িটির দু ধারের কাঁচ তোলা। বন্ধ কাঁচের ওপর কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বয়স অনুপাতে নব হালদারের চোখ এবং কানের কার্যক্ষমতা একটু বেশী প্রবল এবং প্রখর। এককালে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন বলেই, মানুষের মেজাজ মর্জি বুঝতে পারেন চট করে। দ্রুত তিনি তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানলেন, আপনারা হয়ত জানেন, আমিই এখনও পর্যন্ত এ শহরের একমাত্র জীবিত শিল্পী যিনি সারাজীবন ফিমেল রোল করেছি। আমি আমার অভিনীত একটি নারী চরিত্রের সামান্য একটু অংশ আপনাদের অভিনয় করে দেখাচ্ছি।

মাউথপিস থেকে অল্প একটু পিছিয়ে গিয়ে নব হালদার তাঁর পরনের ধুতির খুঁট খুলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মাথায় ঘোমটা টানলেন। হাতঘড়িটিকে খুলে মঞ্চের একপাশে নামিয়ে রাখলেন। চোখ থেকে চশমাটি খুলে পাঞ্জাবীর পকেটে ঢোকালেন। তারপর মাউথপিসের সামনে এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বললেন, ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' নাটকে আমি সাজাহানের কন্যা জাহানারার ভূমিকায় অভিনয় করতাম। 'নাট্য মন্দির'-এর এটিই ছিল বেস্ট প্রোডাকশান। একশ'র বেশি নাইট অভিনীত হয়েছিল। জাহানারার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আমি চল্লিশ বারের বেশি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছি। একবার অভিনয় শেষে

একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা গ্রীণরুমে ঢুকে আমার হাত ধরে টপটপ করে কেঁদে ফেলেছিলেন, বোন, আমরা সব মেয়েরা যদি তোমার মত হতে পারতাম। সামান্য একটু থামলেন নব হালদার, আপনারা কেউ বিরক্ত বোধ করছেন না তো? তাঁর গলার স্বরে করুণ আর্তি, পরে শুনেছিলাম ধনী সম্ভ্রান্ত সেই মহিলার জীবন ছিল খুবই অসুখের। স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি সকলের দ্বারা তিনি নির্যাতিতা ছিলেন। মুখ বুজে সেই দুঃখ কষ্ট অপমান সব সইতেন। জাহানারার প্রতিবাদী চরিত্র তাঁকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে ......!

এই সময় একজন খুক খুক শব্দে কেশে উঠল। সে আওয়াজ থামতে না থামতেই আরও তিন চারজন একইরকমভাবে কেশে উঠল। মুহূর্তে নব হালদার নিজেকে সামলে নিলেন। নিজের অজান্তেই তিনি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের সাগরে ভেসে গিয়েছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের ধৈর্যে টান পড়েছে। তাঁরও এসব বলার কথা ছিল না।

নব হালদার ঘাড় ফিরিয়ে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লাইটম্যানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্টেজের সব আলো নিভিয়ে দিন। কেবল একটা স্পটলাইট। আর ঠিক এইখান থেকে — বলে মাঝ বুকের কাছে একটি হাত এবং অপর হাতটি মাথার কাছে রাখলেন, এই জোন বরাবর রাখুন।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে স্পট লাইটটিকে ঠিকমত বসাতে লাইটম্যানের অল্প একটু সময় লাগল। নব হালদার সেই ফাঁকে এক গ্লাস জল চেয়ে খেলেন। সামান্য জলে হাত দুটিকে ভিজিয়ে, ভিজে আঙ্গুলের আস্তো চাপে ভ্রূ দুটিকে টানটান করলেন। চোখের নিচে এবং চিবুকে জলের প্রলেপ টানলেন। জোরালো আলোয় তাঁর মুখখানিকে একটু অন্যরকম দেখাতে লাগল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড দু চোখ বন্ধ করে নব হালদার মনটাকে এক জায়গায় জড়ো করে নিজেকে জাহানারা এইরকম ভেবে নিয়ে মেয়েলী স্বরে দীপ্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি এখানে কেন, এ কথা ঔরংজীব ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্তে পারছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহা রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করতে।

ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

স্তব্ধ হও ভণ্ড। খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক! — তোমরা তো লক্ষ লক্ষ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে চলে যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্তে পার না!

দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক।

নব হালদার দু চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা শ্বাস ফেললেন, আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।

তুমুল বৃষ্টির মতো হাততালি শুরু হল। দর্শকদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠল, আর একটু প্লিজ।

নব হালদার হাতের চেটোয় চোখ মুছে সামনে তাকালেন। অন্ধকার হলঘরে উপস্থিত দর্শকদের মুখ দেখতে পেলেন না। কিন্তু বুঝতে পারলেন মুহূর্তের ঝাপটায় তিনি পরিবেশটাকে পাল্টে দিতে পেরেছেন। দর্শকদের অনুরোধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুর নেই। সত্যি তারা শুনতে চাইছে। নব হালদারের বুকের মধ্যে অনুভূতির অদ্ভুত শিরশিরানি হল। এখনও পারেন তিনি দর্শকদের আপ্লুত করতে! অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন পনের বিশ বছর বা তারও আগে। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাঁর অভিনয় দেখেনি। হয়ত নামটুকু শুনেছে মাত্র। সেই সূত্রেই আজকের অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁর নামের পাশে ছোট করে লেখা হয়েছে, বিগত দিনের অভিনয় শিল্পী। হালকা আকাশি বড়সড় কার্ডটির বেশি অংশ জুড়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে, প্রধান আকর্ষণ জীবনমুখী গানের জনপ্রিয় শিল্পী মিস ডোডো। ইতিমধ্যে যিনি এসে পৌঁছেছেন এবং দর্শক শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস আবদার এ সবের থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মোটর গাড়ির দু পাশের কাঁচ তুলে গাড়ির ভেতরেই বসে আছেন।

নব হালদার বুঝতে পারছেন অল্প কিছু মানুষ যারা তাঁর অভিনয় দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে স্টেজ না ছাড়ার জন্য অনুরোধ করছে, আর সামান্য কিছুক্ষণ পরে তারাই হয়ত মিস ডোডোর গানের তালে তালে হাততালি দেবে। উন্মাদনায় অস্থির হয়ে সিট ছেড়ে উঠে নাচতেও পারে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সেই মানুষগুলি তাঁর অভিনয় ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছে। একজন শিল্পীর কাছে দর্শক শ্রোতাদের স্বতস্ফূর্ত বাহবার চেয়ে বড় পাওনা আর কিছুই হতে পারে না। বিশেষত নতুন সহস্রাব্দের এই সময়ে, যখন মানুষ পুরনোকে অস্বীকার করছে, ভুলতে চাইছে, তখন তিনি একজন পুরুষ নারী চরিত্রে অভিনয় করে দেখাচ্ছেন। যে চরিত্রটি অনাধুনিক, যার আঙ্গিক এবং ভাষাও এখনকার নাটকে বেমানান, সেকেলে।

নিজের পরিবেশ সম্পর্কে একশভাগ নিশ্চিন্ত হওয়ার পরেও দর্শকদের আর একটু বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন নব হালদার, আপনাদের ভাল লাগছে? সত্যি?

কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠল, একসেলেন্ট। আর একটু প্লীজ।

নব হালদার আগের মতোই লাইটম্যানকে নির্দেশ দিয়ে মাউথ পিস থেকে মুখ সরিয়ে দুবার আস্তে করে কেশে নিয়ে গলাটাকে মসৃণ করে নিলেন। তারপর যেন অনেক দূর থেকে তাঁর গলার স্বর আবছা অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে, এই প্রক্রিয়াটুকুব জন্য ঘাড়টিকে কাত করে কথা বলতে শুরু করে ধীরে ধীরে মাউথ পিসের দিকে তাঁর মুখটিকে এগিয়ে আনতে লাগলেন, যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্মরাজি ভেঙ্গে পড়ে, তখন অসূর্যম্পশ্যারূপা মহিলা যে, সেও নিঃসংকোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। সৈনাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! দাঁড়াও। আমার আজ্ঞা দাঁড়াও। আমি তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্তে আসিনি। আমি নিজের কোন

দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন করতে আসিনি। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এখনও পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে যে তার বিজয় দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? তোমরা ঔরংজীবের ভয় করছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পাঁকে নিক্ষেপ করতে পারো। তোমরা যদি মানুষ হও তো বলো সমস্বরে 'জয় সম্রাট সাজাহানের জয়।' মাথাটিকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে নব হালদার যেন তার জীবনের শেষ ইচ্ছা এবং প্রতিজ্ঞার বার্তাটি মানুষকে শুনিয়ে যাচ্ছেন, এমনি ভঙ্গিতে চড়া সুরে লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, বলো সমস্বরে 'জয় সম্রাট সাজাহানের জয়।'

লাইটম্যান যে কিভাবে বুঝল অভিনয়ের এটিই শেষ সংলাপ, কে জানে! সে স্পট লাইটটিকে আর একটু হেলিয়ে নব হালদারের মুখের ওপর মাত্র কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখেই, হঠাৎ করে সেটি নিভিয়ে দিয়ে স্টেজের মাঝ বরাবর ঝোলানো বড় লাইটটিকে জ্বেলে দিল। দর্শক দেখল নব হালদারের দু চোখে জল টলটল করছে। ঘামে ভিজে পাঞ্জাবী পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। কাঁচাপাকা কয়েকগাছি চুল কপালের সীমানা পেরিয়ে চোখ দুটিকে আধাআধি ঢেকে দিয়েছে। আয়োজকদের একজন তাঁকে আস্তো করে ধরে নিয়ে এসে স্টেজের একপাশে রাখা একটি চেয়ারে বসিয়ে দিল। দুজন যুবতী স্টেজের পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে উঠে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মাঝবয়সী একজন লোক একটি ফুলের মালা এনে তাঁর গলায় পরিয়ে দিল। নব হালদার আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাঁর দুটি হাত বাড়িয়ে দিলেন মেয়ে দুটির উদ্দেশে। গলার মালাটি খুলে আয়োজকদের একজনের হাতে দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, এটা ধরুন। তাঁর হাত এবং পা কাঁপছিল তিরতির কর। দু চোখে জলের কারণে সব কিছুকে আবছা দেখতে লাগছিল। বুঝতে পারছিলেন এখন কিছু বলতে গেলে কান্নার তোড়ে কথা ভেসে যাবে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নব হালদার দর্শকদের দিকে চেয়ে দু হাত জড়ো করে প্রণাম করলেন। তারপর ধীর পায়ে স্টেজ পার হয়ে উইংসের আড়ালে চলে গেলেন।

দুই

নব হালদার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। পেশা নয়। অভিনয় করে তিনি একটি পয়সাও রোজগার করেননি। বরং অভিনয়ের জন্যই যে তিনি সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকটিতে তেমনভাবে নজর দেননি, এ অভিযোগ তাঁর স্ত্রীর। পরবর্তী সময়ে ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর, তারাও মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বাবাকে দোষারোপ করেছে। এমনকি ভর্ৎসনাও করেছে। শিল্পী মানুষ সংবেদনশীল হয়। স্ত্রী ছেলেমেয়ের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে নব হালদার তেমনভাবে নিজের যুক্তিকে খাড়া করতে পারেননি। তার মানে এই নয় যে তাঁর তরফে বলার কিছুই ছিল না। অনেক

কিছুই বলতে পারতেন। সত্যি যদি তিনি আপনভোলা বেহিসেবী মানুষ হতেন, তাহলে তাঁর সংসার কবেই ভেসে যেত। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, তাদের বিয়ে থাওয়া দেওয়া, মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই, একজন মাঝারি রোজগেরে মানুষ যা যা করতে পারে, করা সম্ভব, তা সবই করেছেন। তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের মূলে তাঁর স্ত্রী। নব হালদার একাধিকবার তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়েছেন, সইয়ের কথা শিকেয় তোলা থাকে। একদিন বুঝবে আফটার অল আমি তোমার স্বামী। অগ্নি সাক্ষী রেখে তোমাকে ঘরে এনেছি। কোনদিনই অবহেলা করিনি। ভাব, ভেবে দেখ, যাদের ভরসায় আমায় দুরমুশ পেটা করছ, একদিন তারাই উল্টে গিয়ে আমার জায়গায় তোমাকে বসিয়ে কামান দাগবে।

খুব বড় মাপের যে কোন শিল্পীর নিজস্ব দর্শন তৈরী হয়। সুদূর প্রসারী দৃষ্টি এবং মানুষ চেনার ব্যাপারে অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হন তিনি। নব হালদার ছিলেন মোটামুটি এবং খারাপের মাঝামাঝি মাপের শিল্পী। কিন্তু আশ্চর্যজনকবাবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত আচরণ এবং স্ত্রীর তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, বাস্তবে তার একশভাগ সঠিক সত্যি হয়েছে। একই বাড়ির মধ্যে দুই ছেলের আলাদা সংসার। মেয়ে বছরে একবার আসে বিজয়ার প্রণাম করতে। নব হালাদর এবং তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তান দম্পতির মতো জীবনযাপন করেন। বয়সের ভারে তাঁর স্ত্রী কোনরকমে দুজনের দুবেলার আহার তৈরী বাদে অন্য কোন সাংসারিক কাজ করতে পারেন না। ফলে তাঁরা দুজনে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি অগোছাল। ঘরের আসবাব বিছানা সবই যৎসামান্য এবং জীর্ণ। একই বাড়ির একটি ঘর বাদে বাকি ঘরগুলিতে উজ্জ্বল আলো, টি.ভি., টেপরেকর্ডারে গান। জুতসই রান্নার মনমাতানো গন্ধ।

পুরনো আমলের একটি রেডিও আছে নব হালদারের। দু মাস হল তিনি রেডিওটি শুনতে পারছেন না। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। নতুন ব্যাটারি কেনার সামর্থ নেই। ফলে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা বলা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই। সেটুকু শেষ হয়ে গেলে চোখে হাত চাপা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। তখন তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসে। রেডিওটি ছিল তাঁর এই অসহায় একাকী সময়ে একজন সজ্জন উপকারী সঙ্গী।

তিন

অনুষ্ঠানের আয়োজকরা নব হালদারের গলায় উত্তরীয় এবং মালা পরিয়ে দিয়েছে। বেরোবার সময় একটি ছেলে এক বাক্স মিষ্টি তাঁর হাতে দিয়ে হেসে বলেছে, দয়া করে এটা নিন। মিষ্টির প্যাকেটটি দেখে নব হালদারের মনে পড়ে গেছে স্ত্রীর খুশিখুশি চাউনিটি। বয়স হলে কি হবে, মিষ্টির প্রতি ভদ্রমহিলার অপরিসীম দুর্বলতা। সুগার পরীক্ষা করে দেখা হয়নি কোনদিন। কিন্তু নব হালদারের বিশ্বাস তাঁর স্ত্রীর সুগার হয়েছে। অকারণে রেগে যায় এবং সবসময়েই ক্লান্তি। শরীর জুড়ে ম্যাজমেজে ভাব। এম আই. এসের সামান্য সুদের টাকা যেখানে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়, সেখানে ডাক্তারের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। এরজন্য নিজেকে তাঁর অনেক সময়েই অপরাধী মনে হয়।

মানসিক এই অনিশ্চয়তা এবং বিপন্নতার মধ্যে আজকের দিনটি নব হালদারের কাছে ভিন্ন মেজাজের। দুঃসহ গরমে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগার মতো আরামের। এ শহরের মানুষ, তাঁকে নয়, তাঁর অভিনয় ক্ষমতার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মান জানিয়েছে। এ বড় কম কথা নয়। তাঁর সময়কালের অনেক অভিনেতা তো আজও রয়েছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে তাঁকে বেছে নেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছে তারা। সারাটা পথ এ চিন্তা সে চিন্তার মধ্যে নব হালদারের কানের কাছে 'একসেলেন্ট, আর একটু প্লীজ' এই শব্দ কটি বাজতে লাগল। চোখ না বুজেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন সেই দুজন যুবতীর মুখ যারা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল এবং মাঝবয়সী সেই লোকটি যে একরকম দৌড়ে স্টেজে উঠে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল।

গলির মুখের দোকান থেকে একটি সিগারেট কিনে ধরালেন। তাঁর কাঁধে আড়াআড়িভাবে রাখা উত্তরীয়। দোকানদার বারকয়েক আড়চোখে তাকিয়ে কৌতুহল চেপে রাখতে পারল না, কাঁধে চাদর ঝুলিয়েছেন কেন, কাকা?

নব হালদার সিগারেটে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, চাদর নয় রে। একে বলে উত্তরীয়। একটু থেমে বললেন, জাগৃতি সংঘ আজ আমাকে অনার দিল। রবীন্দ্রভবনে।

দোকানী ছেলেটি 'অ' বলে পান সাজায় মন দিল। নব হালদারের মন খারাপ হয়ে গেল। মুহূর্তে মনে হল ছেলেটি হয়ত 'অনার' শব্দটির অর্থ ধরতে পারেনি। আর তাই স্পষ্ট করে একটু জোরেই, অনার মানে সম্মান। এককালে অভিনয় করতাম কিনা! তুই তখন খুব ছোট। তোর বাবা জ্যাঠারা জানে।

ছেলেটি প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলল না দেখে, নব হালদার দ্রুত দোকান ছেড়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভেজানো দরজা ছেড়ে উঠোনে পা রাখলেন। ছোট ছেলের ঘরে হিন্দী গান বাজছে। হয় রেডিও তা না হলে টি.ভি। নিজের ঘরটি অন্ধকার। তার মানে স্ত্রী শুয়ে আছে। ঘুমোয়নি। জেগেই আছে। আলো সহ্য হয় না বলে কম পাওয়ারের বাল্বটিও নিভিয়ে দিয়েছে। নব হালদার উঠোনের কোণে রাখা বালতির জলে হাত পা ধুলেন। তারপরে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই, তাঁর স্ত্রী বিরক্তিভরা গলায় বললেন, আলোটা নেভাও না। দালানে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়ো।

নব হালদার বাধ্য ছাত্রের মতো স্ত্রীর কথানুসারে ঘরের আলো নিভিয়ে দালানে গিয়ে পোশাক বদলালেন। উত্তরীয়টিকে ভাঁজ করে আলনায় রাখলেন। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল মিষ্টির বাক্সটির কথা। এদিক ওদিক চাইলেন। কোথায় রেখেছেন খেয়াল করতে পারছিলেন না। বাড়ি ঢোকার পর থেকে এখনও অব্দি কী কী করেছেন ভাবতে ভাবতে আচমকা মনে পড়ল হাত মুখ ধোওয়ার সময় বাক্সটি উঠোনে নামিয়ে রেখেছিলেন। তিনি দ্রুত দালান ছেড়ে উঠোনে নেমে এলেন। জলের বালতির পাশে নিরীহ বাক্সটি। নব হালদার বাক্সটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ইঁদুর ছুঁচো বেড়াল কুকুর সব রকমের

পশুর অবাধ বিচরণ ভূমি। খাক না খাক, গন্ধ শুঁকে থাকে যদি বা স্বাদ আস্বাদনের লোভে জিভ দিয়ে চেটে থাকে, তাহলেও মিষ্টিশুদ্ধ বাক্সটি ফেলে দিতে হবে। বারবার নিখুঁত পর্যবেক্ষণের পরে নব হালদার যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে বাক্সটি অক্ষত এবং অনাঘ্রাত আছে, তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এখন সময়টা আশ্বিনের শুরু বলে বাতাসে অসহ্য গরমের ভাব নেই। উপরন্তু ঠাণ্ডা জলে ঘাড় গলা মুখ হাত পা ধোওয়ার জন্য নিজেকে বেশ ফ্রেস মনে হচ্ছিল। শারীরিক আরামের জন্যই বোধহয় মনটাও প্রসন্ন হয়ে উঠছিল। তার ওপর এক বাক্স মিষ্টি।

নব হালদারের কী মনে হল, তিনি গলায় ঝোলানো পৈতেটি বার কয়েক ঘুরিয়ে নিজেকে আর একটু বেশি স্টেডি করার চেষ্টা করলেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অব্যর্থ জয়ের আশায় মানুষ যেভাবে ধীরস্থির অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। তাঁর স্ত্রীর গলায় আবারও বিরক্তির সুর, আলো জ্বালছ কেন? চুপ করে বসে থাকতে পার না? একটু চুপ করে থেকে বললেন, দালানে তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

— তুমি খাবে না? নব হালদাব স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

— না। স্ত্রীব স্পষ্ট জবাব।

— কেন? শরীর খারাপ?

— উঁহু।

— তাহলে?

— এমনিই। নব হালদার কম বয়সী ছেলেদের মতো হাসিহাসি মুখে মাথা নাড়লেন, একবার চেয়ে দেখ। কী এনেছি?

— কী? মাংস? না, পোলাও?

— দূর! দূর! নব হালদার এমন তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ওসব ছাইপাঁশ গিলে কী হবে? যেন মাংস পোলাও খেয়ে খেয়ে তাঁর পেটে চড়া পড়ে গেছে। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে কোমরের আড়ালে রাখা মিষ্টির বাক্স সমেত হাতখানি স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরলেন, একবার চেয়েই দেখো না!

তাঁর স্ত্রী যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যেতে সটান বিছানায় উঠে বসলেন, কী দেখি? কোথায় পেলে? একটু থেমে, নাকি কিনলে? বলে নিজের হাতটি নব হালদারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, একবার দাও-ই না।

— উঁহু। নব হালদার মেয়েলী ভঙ্গিতে বেঁকে দাঁড়িয়ে নারী গলায় বলে উঠলেন,

যাও যাও গিরি
আনিতে গৌরী
উমা আমার বড় কেঁদেছে
উমা কৈলাশেতে
পায় না খেতে

চিনে বাদাম মটর দানা

যাও যাও গিরি ......।

— এমা! এ কী করছ! নব হালদারের স্ত্রীর গলায় বিস্ময়, মেয়েমানুষের মতো দাঁইড়ে। ছিঃ! যেন স্বামীর এ হেন আচরণে সত্যি লজ্জা পেয়েছেন এমনিভাবে মুখটাকে ঘুরিয়ে নিলেন, দরজা জানলা হাট করে খোলা। তার ওপর আলো জ্বলছে। কে কোত্থেকে দেখবে ......!

ব্রীড়াব্রতী নারীর মতো স্ত্রীর অধোমুখে ঘুরে বসাটুকু নব হালদারকে আমোদ দিল। মিষ্টির বাক্সটি চৌকির ওপর নামিয়ে রেখে তিনি সলজ্জ নারীর ভঙ্গিমায় স্ত্রীর চিবুকে আস্তো হাত রেখে বললেন, না দিদি! পরিহাস নয়! আমার উপর তাঁহার যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। অন্তঃকরণে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার না হইলে পুরুষদিগের সেরূপ ভাবভঙ্গী ও সেরূপ কথাপ্রণালী হয় না।

নব হালদারের স্ত্রী স্বামীর এরূপ মেয়েলী গলা এবং নারীসুলভ আচরণের অর্থ ধরতে পারলেন না। কী বলছেন তাও বুঝতে পারলেন না। তিনি বিলক্ষণ জানেন তাঁর স্বামী মদ্যপান করেন না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে যে মানুষটিকে দেখছেন তিনি, এখন এই মুহূর্তে তার আচার আচরণের সঙ্গে ছিটেফোঁটা মিল নেই।

যত দিন গড়াচ্ছিল মানুষটির চোখেমুখে মনমরা ভাব এবং চলাফেরায় আড়ষ্টতা বেশী করে নজরে পড়ছিল। ইতিমধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তাও কমতে কমতে কখনও কখনও 'হুঁ', 'হ্যাঁ', 'আচ্ছা', 'তাই তো' এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্বল্পভাষী বিমর্ষ মেজাজের মানুষটি যদি হঠাৎ করে আহ্লাদী হয়ে ওঠে এবং পুরুষের পরিবর্তে একজন নারীর মতো আচরণ করে, খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, মানুষটি প্রকৃতিস্থ নয়। কিম্বা অকারণে কেউ অপমান করছে বা গভীর কষ্টের খবর শুনিয়েছে কেউ, সেই লজ্জা বা দুঃখকে আড়াল করার জন্য, নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে এমন বিসদৃশ আচরণ করছে।

নব হালদারের স্ত্রী আলুথালু বেশে বিছানা থেকে নেমে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কান্নাভেজা গলায় বলল, বল না, কী হয়েছে তোমার?

নব হালদার সামান্য সরে গিয়ে মিষ্টির বাক্সটি খুলে একটি রসের মিষ্টি স্ত্রীর মুখে জোর করে পুরে দিয়ে আগের মতই মেয়েলী গলায় বললেন, অমি এতকাল মনে করিতাম আমার মতো হতভাগ্যা মানবী ভূমণ্ডলে আর নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছি আমার মতো ভাগ্যবতী অতি অল্প আছে। চির বিয়োগের পর এই অতর্কিত পতিপুত্রসমাগম দ্বারা, আমি যে আজ কি হইয়াছি, বলিতে পারি না। আজ আমার কি উৎসবের দিন! এখনও এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে ......!

হঠাৎ থেমে গিয়ে নব হালদার তাঁর স্ত্রীকে এক হ্যাঁচকায় বুকের কাছে টেনে নিলেন।

তাঁর স্ত্রী শিকারীর জালে আটকে পড়া শিকারের মতো নিজেকে স্বামীর বন্ধনমুক্ত করার জন্য নব হালদারের বুকে সহনশীল ঘুঁষি মারলেন। পরপর কয়েকবার। কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ছাড়ো। কী হচ্ছে? কে দেখে ফেলবে। লক্ষ্মীটি ছাড়ো।

নব হালদার দেখলেন তাঁর স্ত্রীর ঠোঁট উপচে রসের ধারা চিবুক গড়িয়ে নামছে। চোখ দুটিও জল ধরে রাখতে পারছে না। কয়েক ফোঁটা চোখের জলে শাড়ির একটি অঞ্চল ভিজে উঠেছে। নব হালদার তাঁর হাত দুটিকে সামান্য শিথিল করা মাত্র, তাঁর স্ত্রী ছিটকে সরে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়লেন। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছেন এবং বড় বড় চোখ করে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রয়েছেন।

নব হালদার বিছানায় স্ত্রীর গা ঘেঁষে বসে পড়ে অল্প একটু হাসলেন, অ্যাকটিং করছিলাম। ধরতে পারোনি তো?

— ও মা! তাঁর স্ত্রীর গলায় বিস্ময়, তুমি এত ভালো অ্যাকটিং জানো। আগে তো কোনদিন দেখিনি!

— তোমার মতো অনেকেই দেখেনি। আজ দেখল। নব হালদারের গলায় শ্লাঘার সুর, তোমার মতো তারাও অবাক হয়ে গেছে। এই দেখ না, দেখ! বলে তিনি দ্রুত উঠে গিয়ে দালান থেকে উত্তরীয় এবং মালাটি নিয়ে এলেন, আমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে এই উত্তরীয়, মালা, তার সঙ্গে এই মিষ্টির বাক্স। একটু থেমে বললেন, সব, সব দিল।

নব হালদারের স্ত্রী পা দুটি বুকের কাছে জড়ো করে ঠিক যেন কোন অভিমানী কিশোরী এমনি ভঙ্গিতে গাঢ় গলায় বলে উঠলেন, কি করে জানব, তুমি এত সুন্দর পেলে কর। জানলে কি আর সারা জীবন ধরে অত খোঁটা দিতাম!

— আজ জানলে তো। নব হালদারের গলায় তৃপ্তি ঝরে পড়ছে, বল? এখন কী দেবে আমায়?

— কী আবার? বলে তাঁর স্ত্রী বাক্স থেকে একটি মিষ্টি তুলে নিয়ে যেভাবে তাঁর স্বামী মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে নব হালদারের চোয়ালটি বাঁ হাতে শক্ত করে চেপে ধরে, অল্প হাঁ-মুখের মধ্যে মিষ্টিটি গুঁজে দিলেন।

স্বামী স্ত্রী দু জনের কারোরই খেয়াল নেই সময় কতটা গড়িয়ে গেছে। নিশ্চুপ পাশাপাশি বসে। যেন দুজনেরই সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

এক সময় নব হালদার বেশ শব্দ করে একটা শ্বাস ফেললেন। তারপর স্ত্রীর পিঠে আস্তো হাত রাখলেন, চলো, খেয়ে নিই।

প্রতিদিনের মতোই দালানের কম আলোর মধ্যে স্বামী স্ত্রী মুখোমুখি খেতে বসলেন। খাদ্য তালিকাতেও কোন হেরফের নেই। নব হালদার লক্ষ্য করলেন তাঁর স্ত্রী বিরস মুখে ভাতের দলা মুখে পুরছেন। পরিমাণে অল্প একটি মাত্র তরকারি থালার এক কোণে।

নব হালদারের যেন হঠাৎ করে মনে পড়ল, দাঁড়াও। দাঁড়াও।

তিনি উঠে গিয়ে ঘর থেকে মিষ্টির বাক্সটি নিয়ে এলেন, আজ বরং ভাত কম খেয়ে মিষ্টি খাওয়া যাক।

নব হালদারের স্ত্রী আস্তো করে মাথা তুলে ভয় ভয় গলায় বললেন, এই বয়সে হঠাৎ করে একদিনে এত মিষ্টি খেলে ......! একটু চুপ করে থেকে বললেন, সহ্য হবে?

— না হলেই বা কি? নব হালদার বেপরোয়ার মতো বলে উঠলেন, কেউ তো আর আমাদের খবর নিতে আসছে না।

— তাই তো বলছিলাম। নব হালদারের স্ত্রী মিনমিনে গলায় বলে উঠলেন, কী দরকার বাপু, একসঙ্গে এত খাওয়ার?

— বেশ করব। নব হালদার এমনভাবে গলা চড়িয়ে বললেন যেন এ বাড়ির অন্য দুই সংসারের মানুষজন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে, তুমি না খাও, আমি খাব। এটা মাগনা পাওয়া নয়। গুণী সমঝদার মানুষের ভালবাসার উপহার। বুঝলে না তো? বলে নব হালদার চোখের ইশারায় তাঁর স্ত্রীকে দুই ছেলের ঘরের উদ্দেশে তাকাতে বললেন, এই পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ। সবাই অভিনয় করছি। তুমিও। আমিও। আবার ভিলেন বদমাইশের রোলও করছে কেউ কেউ। বোঝা গেল কিছু?

বাস্তবিক নব হালদারের স্ত্রী বুঝতে পারছেন না, তাঁর নির্বিরোধ স্বল্পবাক শান্তিপ্রিয় স্বামীটি হঠাৎ চীৎকার করে এমন এলোমেলো বকছেন কেন?

ভদ্রমহিলা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, আর দুটো মিষ্টি দিই তাহলে?

— আলবাৎ। নব হালদার বেশ জোরে বলে উঠলেন এবং থালার মাঝখানে আঙুলের টোকা মেরে শব্দ করে দেখালেন, এইখানে দাও। তাঁর কথা বলার ধরণ ধারণে একজন সফল দাপুটে গৃহকর্তার মেজাজ। চেরা চোখে দেখে নিয়েছেন দুই ছেলের ঘরই অন্ধকার। কিন্তু দু ঘরের দুটি জানলায় দু জন করে মোট চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

নব হালদারের স্ত্রী স্বামীর সামনে বসে ধীরস্থিরভাবে খাচ্ছেন। তাঁর দু কানে বাজছে, আমি এতকাল মনে করিতাম আমার মতো হতভাগ্যা মানবী ভূমণ্ডলে আর নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছি আমার মতো ভাগ্যবতী অতি অল্প আছে। এখনও এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতেছে।

পিঞ্জরে বসিয়া নহে

এক

রেকর্ড প্লেয়ারে নিচু সুরে গান বাজছিল, 'শরতে আজ কোন্ অতিথি/এল প্রাণের দ্বারে।'

দুচোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে গান শুনছিল অমিতাভ। এই গানটি সে একাধিকবার শুনেছে। কিন্তু আজ ২৫শে বৈশাখের রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে বহুশ্রুত গানটির বাণী এবং সুর মিলেমিশে তাকে অদ্ভুত শিহরিত করছিল। ক্ষণিকের জন্য হলেও সে জাগতিক অস্তিত্ব বিস্মৃত হল। আর ঠিক তখনই বেজে উঠল, টুং টাং, টুং টাং।

অমিতাভর কানে সে শব্দ অতি ক্ষীণ অচেনা এবং তাই অলৌকিক বা মহাজাগতিক কোন শব্দ বলে মনে হল। রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছে, 'ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে'।

অমিতাভর অন্যমনস্কতা হেতু তার স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা খুলে উঁচু গলায় প্রশ্ন করল আগন্তুককে, কে? কাকে চান?

সংক্ষিপ্ত জবাব পাওয়া গেল, হরিপদ। মুহূর্ত থেমে, অমিতাভ। আগন্তুক মোটেই তেমন জোরে কথা বলেনি। কিন্তু নিজের নামটি অমিতাভ স্বচ্ছন্দে শুনতে পেল। মুহূর্তে তার ঘোর লাগা আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। নিজেকে সহজ অথচ আকর্ষণীয় দেখাবার জন্য অমিতাভ, পাঞ্জাবীর পুট, মাথার চুল, চোখের চশমা সব ঠিক ঠিকভাবে বিন্যস্ত করে নিল। অমিতাভ শহরের একজন নামী অধ্যাপক। রবীন্দ্রচর্চায় তাঁর পারদর্শিতা বিশেষভাবে সমাদৃত।

চৌকাঠের ওপাশে হরিপদ দলুইকে দেখে অমিতাভ যত না অবাক হল, তার চেয়ে বেশি ভয় পেল। লম্বা রোগা হরিপদ, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি এবং ঝোপঝাড়ের মতো একমাথা রুক্ষ তামাটে চুলসমেত অমিতাভর দিকে চেয়ে হাসল, চিনতে পারছো? মুহূর্তের কালক্ষেপে অমিতাভ দেখে নিল, হরিপদর দাঁতগুলি হলদেটে এবং অসংবদ্ধ। নিজেকে সহজ এবং সপ্রতিভ রাখার জন্য অমিতাভ যেন খুব ব্যগ্রতায় সোজা হয়ে বসল এবং দুহাত সামনে বাড়িয়ে সাহচর্য প্রকাশ করল, মাই গড, হরিপদ! ভেতরে এসো।

হরিপদ অমিতাভর স্কুল জীবনের সহপাঠী। পড়াশুনায় দুজনের মধ্যে কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় বন্ধুত্ব গাঢ় ছিল। অমিতাভ যেমন স্থির নিশ্চিত ছিল, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব কটি পর্ব সে শেষ করবেই, হরিপদরও বিশ্বাস জন্মে গেছিল, স্কুল জীবন শেষ করেই তাকে পড়াশুনায় ইতি টানতে হবে। দুজনের কেউই ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিল না। কিন্তু দুজনের ধারণাই অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। অমিতাভ নামী অধ্যাপক।

হরিপদ রুগ্ন কারখানার অস্থায়ী শ্রমিক। শহরের চৌহদ্দির মধ্যে কখনও সখনও দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু অসম অর্থনৈতিক অবস্থান হেতু উভয়ের মধ্যেকার সেতুটি দুজনের কেউই অতিক্রম করতে পারে না। দুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পরস্পর হাসি বিনিময় করে। বা বড় জোর 'কেমন আছ?' — এর অধিক শব্দব্যয় করার মতো দুঃসাহস বা সংকোচ দুজনের কেউই দেখায় না।

হরিপদ, ঠিক স্বচ্ছন্দে নয়, কিন্তু বসল সোফার ওপর। হাত দুটিকে হাঁটুর ওপর আলতো রেখে। কৌতূহলী চোখে অমিতাভর ঘরের আসবাব, টেবিলের ওপর ছড়ানো এলোমেলো বই কাগজ, তিনটি চারটি দামী পেন, এইসব দেখতে লাগল। রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছে, 'যে এসেছে তাহার মুখে/দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে/দুয়ার খুলে তাহার সাথে/বাহির হয়ে যা রে।'

অমিতাভ চোখ সরু করে হরিপদকে দেখল কয়েকবার। হরিপদর হঠাৎ করে আসা এবং সন্ধানী চাউনি, অমিতাভর কাছে বেশ রহস্যময় বলে মনে হল। সে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ! কী মনে করে? হরিপদ যেন অমিতাভর প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। দুচোখ বড় বড় করে বলল, এত বই তোমার? সব পড়েছ?

অমিতাভ হেসে ফেলল, পড়েছি। সব মনে নেই।

— আর এত ক্যাসেট! সব তোমার?

অমিতাভ ছোট করে ঘাড় দোলাল, হুঁ।

— বেশ আছ। বলে হরিপদ উঠে দাঁড়াল। তারপর বুক সেলফের সামনে গিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে কাঁচের পাল্লার ওপর আস্তো হাত বোলাতে লাগল। বাচ্চারা যেভাবে অ্যাকোরিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচের ওপর হাত ঠেকিয়ে রঙিন মাছের স্পর্শ পেতে চায়, অবিকল সেই ভঙ্গিতে। বুক সেলফে সার দিয়ে দাঁড় করানো রবীন্দ্ররচনাবলী।

হরিপদর এমন আচরণে অমিতাভর মনে করুণা জাগল। করুণা না বিজাতীয় শ্লাঘা! সে হরিপদর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে আস্তো হাত রাখল, এই বইগুলিই আমার সঙ্গী। আমার সব। একটু থেমে বলল, তুমি পড়বে?

হরিপদ হেসে ঘাড় দোলাল, এইসব বই পড়ার মতো পণ্ডিত আমি নই।

— না, তা কেন? অমিতাভ পরিবেশটা সহজ করতে চাইল, রবীন্দ্রনাথ সবার জন্যই লিখেছেন।

— সবাই তা জানতে পারল না। হরিপদ আস্তে করে বলল।

— না পড়লে ...!

হাত তুলে অমিতাভকে থামিয়ে দিল হরিপদ, যারা পড়েছে, তারাও সবাইকে জানাল না।

হরিপদর কথার শ্লেষটুকু অমিতাভ ধরতে পারল। তার রেগে যাওয়া বা অপমানিত বোধ করা উচিত ছিল। পরিবর্তে সে অপলক হরিপদর মুখের দিকে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলল, চা খাবে তো?

চায়ের কাপ হাতে নিশ্চুপ দুজনে মুখোমুখি বসে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় অমিতাভ হাঁফিয়ে উঠল, কারণ নিরন্তর একটি ভয় তাকে তাড়া করছিল অবচেতনে, এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ নয় তো, যখন বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে হরিপদ তার শিরা ওঠা হাত দুটি হঠাৎই বিসদৃশ রকম লম্বা করে বাড়িয়ে ধরবে তার দিকে! অমোঘ নির্দেশের গলায় বলবে, কিছু দাও।

— গান শুনবে? অমিতাভ হঠাৎই বলল।

— না।

— স্কুলে বেঞ্চ বাজিয়ে গান গাইতাম, ছোট্ট আমার পানসিখানি/সঙ্গে সঙ্গে কে কে যাবি আয়। অমিতাভ একটু থামল, মনে পড়ে?

হরিপদ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল, দু এক কলি এখনও গাই। তবে অন্য গান। শুনবে? বলে যেন কোন গোপন কথা বলছে এমনি সতর্কতায় অমিতাভর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে আধা সুরেলা গলায় গেয়ে উঠল, হরি দিন তো গেল/সন্ধ্যা হল/পার কর আমারে।

অমিতাভ তার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে দেখে হরিপদ যেন মজা পেল, চোখ নাচিয়ে বলল, আবৃত্তিও করি, ঘরেতে অভাব, পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া।

অমিতাভর মনে হল পোশাকের আড়ালে তার সারা শরীর পুড়ছে। তার ঘর ভর্তি বই, গ্যানের ক্যাসেট, তিন চারটি দামী কলম, দরকারি অদরকারি সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরের মেঝেতে, জানলার বেড়ে, আলমারির মাথায়। অসুস্থ মানুষের মতো সে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল চুপ করে। একসময় হরিপদর গলার আওয়াজ শুনতে পেল, আজ চলি। অমিতাভ সাবধানে মাথা তুলে হরিপদর মুখের দিকে তাকাল, সত্যি করে বল তো, তুমি কেন এসেছিলে?

— এমনি। বলে হরিপদ হাসল।

অমিতাভ হরিপদর চলে যাওয়া দেখল। পিছন থেকে হরিপদকে তার ঈষৎ কুঁজো, আর তাই সামনে ঝুঁকে হাঁটছে বলে মনে হল।

দুই

রবীন্দ্রভবনের সুসজ্জিত মঞ্চে ধোপদুরস্ত পোশাকের অনেকের মধ্যে অমিতাভ বসে। হল ভর্তি সুবেশ নারীপুরুষ। অল্পবয়সী কিছু ছেলেমেয়েও আছে। ঝকঝকে চেহারার।

'রবীন্দ্র রচনার প্রাসঙ্গিকতা' ঘোষক থেমে থেমে বললেন, এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন অধ্যাপক অমিতাভ মিত্র। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে সামান্য ফিসফিসানি হল, নড়েচড়ে বসলেন দু চারজন। অমিতাভ সাবলীল হেঁটে গেল মঞ্চের একপাশে

মাউথপিসের সামনে। তারপর ধরা গলায়, উপস্থিত রবীন্দ্র অনুরাগী এবং মঞ্চে উপবিষ্ট গুণীজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, এইটুকু বলে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে স্পষ্ট উচ্চারণে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, — আমাদের এই শহরে পাঁচশ না হোক, তিনশজন মানুষ আছেন, যাঁরা দুশোর বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্ভুল স্বরলিপিতে গাইতে পারেন। অন্তত একশজন আবৃত্তিকার আছেন, কমা কোলন দাঁড়ির নিখুঁত প্রয়োগবিধি মেনে দেড়শোর বেশি রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করতে পারেন। রবীন্দ্র গবেষকের সংখ্যাও এ শহরে দশের তিন চার বা পাঁচ গুণিতক। এমনকি রবীন্দ্রনাথ রং কানা ছিলেন, এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী চিত্র সমালোচকও এ শহরে আছেন বেশ কয়েকজন। রুগ্ন কারখানার অস্থায়ী শ্রমিক হরিপদ দলুই। তার মেঘ-মেদুর মন এবং স্বপ্নশূন্য দুই চোখ এই পৃথিবীর রূপ রস বর্ণ গন্ধের কোন স্পর্শ পায় না। সে একটিমাত্র গানের দুটি ছত্র এবং মাত্র একটি কবিতার দুটি পংক্তি জানে। বুকের মধ্যে গুনগুন করে, হরি দিনতো গেল/সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।

নিভৃতে অস্ফুটে আওড়ায়, ঘরেতে অভাব, পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া।

হে আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজনেষু রবীন্দ্র অনুরাগী শিল্পী এবং গবেষকবৃন্দ, আপনারা অনুগ্রহ করে একবার হরিপদ দলুইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। হরিপদ দলুই হরিপদ কেরানীর বাঁশির সুর শোনেনি। ক্ষুধা তৃষ্ণা অপমানে অর্ধমৃত মানুষের, নতুন প্রেরণায় বেঁচে ওঠার গানও তাকে কেউ শোনায়নি। বাঁশির প্রেমের আলিঙ্গনে, চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত গানের পরশে হরিপদ দলুই হয়ত হার-না-মানা বিশ্বাসের জোরে জীবনটাকে নতুন মাত্রায় আঁকড়ে ধরতে পারে। সে আমাদের এই শহরেরই বাসিন্দা। নিবাসস্থল খানারখোল। কনকশালী। ডাকঘর-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী। সূচক ৭১২১০১।

লেখা পাঠ শেষ করে দুহাত জোড় করে 'নমস্কার' বলল অমিতাভ। পঠিত কাগজটি সযত্নে পাঞ্জাবীর পকেটে পুরল। হাততালির শব্দ পাওয়া গেল না। অস্ফুটে 'বাঃ' বা 'চমৎকার' এই জাতীয় কিছুও বলল না কেউ। অমিতাভ লক্ষ্য করল উদ্যোক্তা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট গুণী মানুষের দল, ভ্রূতে সামান্য ঢেউ তুলে চেরা চোখে দেখছে তাকে। চেয়ালের দৃঢ়তা কোনমতেই লুকিয়ে রাখতে পারছে না দু চারজন।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার অল্প আগে অমিতাভ হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গেটের কাছে উদ্যোক্তাদের একজন অবাক গলায় বলল, আপনি চলে যাচ্ছেন?

অমিতাভ ঘাড় দোলাল, হ্যাঁ।

— দাঁড়ান, একটা রিক্সা ডেকে আনি।

— দরকার নেই। অমিতাভ বলল, পায়ে হেঁটেই যাই।

— তাহলেও? লোকটির গলায় সংকোচের সুর, আপনি একজন আমন্ত্রিত অতিথি।

— তাতে কি হয়েছে? সহজভাবেই বলল অমিতাভ, আজ একটু অন্যরকমভাবে ফিরি।

লোকটি এ কথার কোন অর্থ বুঝল না। কোন জবাবও দিতে পারল না।

অমিতাভ সামনের দিকে বেশ কিছু পা এগিয়ে গেছে, একটি কিশোর পিছন থেকে দৌড়ে এসে তার পথ আড়াল করে দাঁড়াল। দৌড়ে আসার ধকলে কিশোরটি অল্প অল্প হাঁফাচ্ছিল। দারুণ লিখেছেন। ঘোর লাগা গলায় বলল কিশোরটি, ভাবাই যায় না। একটু থেমে বলল, লেখাটির নামকরণ করেন নি?

অমিতাভ থমকে গেল, তাই তো!

সে স্থির দাঁড়িয়ে দু চোখ বুজে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ কে যেন তার বুকের গভীর থেকে ধীর প্রত্যয়ী গলায় বলে উঠল, 'পিঞ্জরে বসিয়া নহে'।

নিজের অজান্তেই অমিতাভর স্নেহার্দ্র হাত তখন কিশোরটির কাঁধ ছুঁয়ে ফেলেছে।

জীবন জিজ্ঞাসা অথবা পরবৈরাগ্য

'যে তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ — এই তিন প্রকার গুণের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই জীবের স্বরূপ প্রকাশ করে।' — পাতঞ্জল যোগসূত্র।

মল্লিক কাশেম হাটের মুখে দুলাল পালিতের একটি মুদির দোকান আছে। দোকানটি তেমন চলে না। আবার চলেও। দুলাল পালিতের সংসার প্রতিপালিত হয় এই দোকানটির উপার্জন থেকে।

পৈতৃক বাড়ি। শরিকি বিবাদহেতু এখনও ভাগ বাঁটোয়ারা হয়নি। দুলাল পালিত পিতার একমাত্র সন্তান। সেই কারণে তার অংশে দুটি ঘর, একটি দালান, রান্নাঘর এবং কলঘর। জ্যাঠা এবং কাকার একাধিক পুত্র সন্তান বলে, তারা একটি ঘর এবং সরু একফালি দালানের মধ্যে বসবাস করে। দুলালের মতো তাদের পৃথক রান্নাঘর বা কলঘর নেই।

বাড়িটির শরীর জরাজীর্ণ। দেখতে শ্রীহীন। ভাগের মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে না। বাড়িটার দশাও অনুরূপ। তবু মাথা গোঁজার একটি নিশ্চিত আশ্রয়। অন্যথায় এই দুর্মূল্যের দিনে ভাড়া বাড়িতে থাকার সামর্থ দুলালের হোত না। তার জ্ঞাতি ভাইদেরও না। কারণ তারাও কেউ সুরোজগেরে নয়।

দুলাল দুই সন্তানের পিতা। মেয়ে বড়। সামনের বছরে মাধ্যমিক দেবে। ছেলে নবম শ্রেণীতে পড়ে। মেয়ে এবং ছেলের বয়সে এক বছরের ফারাক। দুলালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তার স্ত্রীর তীব্র কামনায় দ্বিতীয় সন্তানের আগমন।

দুলাল প্রকৃতিতে আস্তিক। সন্তান ঈশ্বরের দান এ কথা সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। তৎসত্ত্বেও কোন কারণে মনোদৌর্বল্য এলে তার মনে হয়, দ্বিতীয় সন্তানটি তার ইচ্ছাশক্তির অপারগতার ফসল। অর্থাৎ রজঃ গুণের প্রতি ক্ষীণ আসক্তি এবং প্রবল বিতৃষ্ণা না জন্মানোর জন্যই নিজের মনকে সে নিরুদ্ধ রাখতে পারেনি। এটা তার ব্যর্থতা। স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায়।

দুলাল কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে যৌবনকালে। তখন কিছুদিনের জন্য তার মনে বৈরাগ্যভাব এসেছিল। জগৎ সংসার পার্থিব সম্পদ সব কিছুকে অসার অপাংক্তেয় মনে হোত। পিতাব দোকানের গদিতে বসার পরিবর্তে নির্জনে একাকী উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোয় বেশি তৃপ্তি পেত। এই সময় একদিন রেল স্টেশনের পশ্চিমপাড়ের গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আচমকাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, পুকুর ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা সদ্যস্নানা সিক্তবসনা এক যুবতীকে দেখে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও সে পারেনি। স্বাস্থ্যবতী যুবতীটির চাউনিতে সে একই সঙ্গে লজ্জা এবং প্রশ্রয়ের ছায়া

দেখতে পেয়েছিল। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে দুলাল যুবতীটিকে অনুসরণ করে তার বাড়ি চিহ্নিত করে এসেছিল।

এরপর দুলাল তার বৃদ্ধ বাবাকে অকাট্য যুক্তির দ্বারা বিবাহের উপযোগিতা, সংসারে একজন নারীর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বুঝিয়েছিল দু পাঁচদিন নয়। টানা বিশ দিন। যুক্তি ব্যাখ্যার সাথে সাথে অসহায় বৃদ্ধকে ভীতিপ্রদর্শনকারী কিঞ্চিত বাক্য প্রয়োগও করেছিল।

দুলাল কৈশোরে মাতৃহীন। তার বিপত্নীক পিতার গোপন ইচ্ছা ছিল শান্ত সুশীলা স্বভাবের সৎ কিন্তু দরিদ্র পরিবারের অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একটি মেয়েকে পুত্রবধূ করে আনবেন। পুত্রের উদ্দাম বাসনার কাছে বৃদ্ধ পিতাকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

মাত্র মাস খানেকের মধ্যে দুলাল আপন পছন্দের মেয়েকে বিবাহ করেছিল। বিবাহের প্রথম বর্ষপূর্তির একুশ দিন পূর্বে তার কন্যার জন্ম হয়েছিল। এই বৎসরাধিক কালের মধ্যেই দুলাল নিশ্চিত জেনে গিয়েছিল তার স্ত্রী দুর্মুখ প্রকৃতির নারী। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। মূলত পুত্রবধূর অমানবিক হৃদয়হীন ব্যবহারে দুলালের পিতা প্রথমে অন্তর্মুখী, তারপরে ব্যবসা সম্পর্কে অনাগ্রহী হলেন। অচিরাৎ শয্যা নিলেন এবং চিকিৎসার জন্য সময়ের কোনরকম অপব্যবহার না করে দেহত্যাগ করলেন।

পিতার শরীর মনের ক্রমাবনতি এবং মৃত্যুর কারণ দুলাল সম্যক বুঝতে পারল। ততদিনে তার শকুনি শ্বশুর এবং দুর্যোধন শ্যালকের অর্থ আত্মসাৎ করার প্রবণতাটি সে ধরতে পেরে গেছে। দুলাল স্বভাব শান্ত মানুষ। সরাসরি সংঘাত বা কলহে মত্ত না হয়ে সে শ্বশুরকূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। তার স্ত্রী, বাবা মা বা ভাইয়ের বিষয়ে ছেঁড়া ভাঙ্গা কোন কথা বলতে শুরু করলে, সে দুঃখের কথায় হাসল। হাসির কথায় নিরুত্তর রইল এবং দুদিন তিনদিন বেশ কয়েকদিন খাওয়া অর্ধসমাপ্ত রেখে উঠে পড়ল।

দুলালের স্ত্রী বুদ্ধিমতী। স্বামীর এমনতর আচরণের অর্থ ধরতে পারল। নিজের বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করে বাবা ভাইয়ের পরিবর্তে স্বামীর অনুগামিনী হল। স্ত্রীর মতিগতি দুলালকে তৃপ্ত করল। তার মনে হল তার স্ত্রী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং কৃতকর্মের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত।

অনুশোচনার আগুনে পাপ নির্মূল হয়। দীক্ষাগুরুর এই আপ্তবাণী দুলালের মনে পড়ল। সে আগের চেয়েও বেশি ধার্মিক এবং গুরুর চরণাশ্রিত হল। গুরুর নির্দেশমত প্রতিদিন রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসার আগে সে বিভিন্ন ধর্মীয় গল্প, দীক্ষালাভের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রীকে বোঝাতে লাগল। একই বিষয়ে বারবার শুনতে শুনতে সেই বিষয়টির প্রতি যে কোন মানুষেরই কৌতূহল জন্মায়। দুলালের স্ত্রী একদিন বিছানায় সটান উঠে বসে ঘোষণা করল, সে'ও দীক্ষা নেবে। দুলালের মনে হল, স্ত্রীর এমত অভাবনীয় সিদ্ধান্তের পিছনে তার কোনই ভূমিকা নেই। গুরুদেবের ইচ্ছানুসারেই এমনটি সম্ভব হল।

শুভদিনে শুভক্ষণে গুরুগৃহে দুলারের স্ত্রীর দীক্ষাদান অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠান শেষে দুলাল তার স্ত্রীকে তৃপ্তির সুরে বলল, আর কোন ভয় নেই। এখন থেকে তুমি এবং আমি

দুজনেই শুদ্ধ আত্মার মানুষ। সংসারের মধ্যে থেকেই আমাদের দুজনের লক্ষ্য হবে লোভ লালসা কামনা বাসনাকে জয় করা। রাগ বিদ্বেষ ঘৃণাকে ত্যাগ করা।

স্ত্রীকে নিশ্চুপ দেখে দুলাল আশ্বস্ত বোধ করল এবং গুরুর মুখে একাধিকবার শোনা কথাগুলির কিয়দংশ আবৃত্তির মতো করে বলল, এইরূপে অনেকদিন মনকে নিরুদ্ধ রাখলে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তখন নিশ্চিত রূপে বোঝা যায় যে, সুখ শান্তি যা কিছু সব আমার ভেতরেই আছে। আমার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর কোন প্রয়োজন নেই।

এই অবস্থাকে বলে পরবৈরাগ্য।

দুই

দুলালের দোকানঘরে তার দীক্ষাগুরুর তিনটি ছবি আছে। একই মানুষের ভিন্ন পোশাকের ভিন্ন মেজাজের ছবি। এ ছাড়া রাধাকৃষ্ণ এবং শিবকালীর দুটি ক্যালেন্ডার আছে। ঘরটি পুরনো আমলের। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে। প্রবল বর্ষায় ছাদ চুইয়ে টুপটাপ জল পড়ে। ছোট একটি জানলা আছে। কিন্তু সেটি খোলা যায় না। কারণ জানলার নিচে পাঁকভর্তি বিশাল নর্দমা। হাটের মানুষ নর্দমায় মল মূত্র ত্যাগ করে। অনেকদিন ধরেই দুলাল ভাবছে দোকানঘরটির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তার সঙ্গে ওয়ার্ড কমিশনারকে বলে নর্দমাটির গতিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। অন্যথায় দুর্গন্ধভরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে প্রতিদিন বেশ কিছু ঘণ্টা কাটানোর ফলে অচিরাৎ সে পেটের গণ্ডগোল বা বুকের রোগে আক্রান্ত হবে।

আজ কাল পরশু করে ঘরটির ব্যাপারে দুলাল আজও কিছু করে উঠতে পারল না। কারণ সে নিজেই বুঝতে পারে ব্যবসা সম্পর্কে তার উৎসাহ এবং উদ্যমে ভাঁটা পড়েছে। দ্বিতীয় কোন আয়ের পথ নেই বলেই তাকে বাধ্য হয়ে নিত্য দোকান খুলতে হচ্ছে। দরদাম করে জিনিস বিক্রি করতে হচ্ছে এবং খদ্দেরদের সঙ্গে অনর্গল অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। সংসারের খুঁটিনাটি, বাজাবদর, উঠতি ছেলেমেয়েদের চালচলন, রাজনীতি, এইসব ছাইপাঁশের বাইরে কাজের কথা কয় কজন?

দু একজন শুদ্ধ মনের মানুষ আছে। যারা ধর্মীয় কথাবার্তা বলে। আধ্যাত্মিক আলোচনা করে। কিন্তু তারা তো রোজ আসে না। মাঝেমধ্যে আসে। তাও আবার এমন সময়ে এলো, যখন খদ্দেরের ব্যস্ততা, হৈ হট্টগোল, হাঁসফাঁস গরম। তার মধ্যেই দুলাল সেই মনের মানুষটিকে আপ্যায়ন করে দোকানের ভেতরে ডাকে। ধুতির খুঁটে হাতল ভাঙ্গা কাঠের চেয়ারের ধুলে ঝেড়ে বসতে দেয়। কর্মচারীকে চা আনতে বলে।

হাটের সব ব্যবসাদার জানে, দুলাল পালিত ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। 'ভাই', 'দাদা' ছাড়া কথা বলে না। অন্যায্য দাম নেয় না। যে পদ্ধতিতে লোকে গৃহদেবতার নিত্যসেবা করে, অবিকল সেই পদ্ধতিতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, ধূপ জ্বেলে এবং পেতলের রেকাবিতে বাতাসা এলাচদানা দিয়ে দীক্ষাগুরুর ছবির সামনে রেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে ব্যবসার কাজকর্ম শুরু করে। বুক খালি করে শ্বাস ফেলে শব্দ করে। কোন ভিখারীকে দুলাল ফেরায় না।

ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে প্রতিদিন প্রথমে একটি গরু এবং তার পরেই একটি কুকুর আসে। দুলাল নিজের হাতে এই অবলা জীবদুটিকে খাওয়ায় এবং তাদের মাথায় গলায় স্নেহার্দ্র হাত বুলিয়ে দেয়।

হাটে বাজারে যেমন হয়, তুচ্ছ ঘটনার স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অশ্লীল কথাবার্তার চাপান উতোর। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধাক্কাধাক্কি হাতাহাতি। তখন যে যেদিকে পারে দৌড়ায়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় ঝপাঝপ করে। কিছু পরেই আবার সব স্বাভাবিক। তখন বোঝাই যায় না অল্প সময় আগে এখানকার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছিল। অযথা ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি করে মানুষ যে কী পায়! কে জানে! অশান্তির মধ্যে জড়াতে ভালবাসে অধিকাংশ মানুষ। কারণটি হয়ত খুবই সামান্য সাদামাটা। কিন্তু হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে 'নয়' কে 'হয়' করার প্রবণতা বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে।

দুলালের বিশ্বাস এই জাতীয় অশান্তি সৃষ্টিকারী মানুষগুলিকে যদি সৎ উপদেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহলে তারা কখনই বিতর্কে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। কলসির আঘাত সয়েও কেউ যদি 'প্রেম দেবো' বলে আকুল ভঙ্গিতে দু হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, তাহলে অতি বড় হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষেরও মনের পরিবর্তন হবেই হবে।

আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি পশু লুকিয়ে রয়েছে। তমোগুণের প্রতীক। সৎ গুরুর সান্নিধ্যে এলে, সৎ আলোচনা করলে, মনের ভেতরের এই পশুটিকে নিজের আয়ত্তে রাখা যায়। 'ভাই', 'বাছা' বলে বুঝিয়ে বললে সে যত বড় বেয়াদব লোক হোক না কেন, আঘাত হানার আগে ক্ষণিকের জন্যও থমকে দাঁড়াবে। সমাজে ভাল-র সঙ্গে মন্দ মানুষ মিশিয়ে রয়েছে। মধুর বাক্য প্রয়োগ বা সুযুক্তির দ্বারা তাকে বুকে টেনে নিলে, আপনিই তার হাত থেকে ছোরা পিস্তল খসে পড়বে। তমোগুণের প্রশমন করতে পারলে তবেই না চিত্তশুদ্ধি! তখনই চেনা যাবে আমি কে! কী আমার স্বরূপ! উপলব্ধি করা যাবে আমার মধ্যেই সৃষ্টির আনন্দের বীজ!

তা বলে রাতারাতি সব মানুষ তো এমনটি হয়ে যাবে না। এর জন্য সময় লাগবে। অবতাররা তো এর জন্যই বারেবারে মানুষের চেহারা ধরে পৃথিবীতে এসেছেন। দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন তো এই কারণেই। দীক্ষায় কেবল দেহ শুদ্ধ হয় না। মনের মধ্যে নেতি নেতি ভাব জাগে। ভাবের উচ্চাসনে মন আপনিই স্থির হয়ে থাকে। তখন সত্ত্বঃ তমঃ রজঃ এই তিন গুণের প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মায়।

দুলাল পালিত এই ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বলেই সকলের চেয়ে সে ভিন্ন। তার পরিচিত প্রতিবেশীরা যেমন, হাটের ব্যবসায়ীরাও তাকে নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ বলেই জানে।

দুলাল নিজেও ভাবে আর বুঝি বেশি দেরী নেই। সংসারে থেকেও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, পাঁকাল মাছের মতো চারপাশের আবর্জনার মধ্যেও নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, সেই আনন্দময় সুসময় আগতপ্রায়।

তিন

দুলালের হিসেব মতো ভাবনা চিন্তা সব কিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছিল। হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল।

অন্য দিনের তুলনায় ছুটির দিনে হাটে মানুষের ভিড় বেশি হয়। ভিড়ের মধ্যে গা লুকিয়ে কুমতলবী বদমানুষও থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসাদারকে চোখ কান বেশি করে সজাগ রেখে কাজ করতে হয়। ছোটখাট বেনিয়মে ধরা পড়া ব্যক্তিকে দু চার ঘা দিয়ে ছেড়েও দেওয়া হয়। দুলালের দোকানেও যে এমনটি দু একবার হয় নি তা নয়। দুলাল কিন্তু চীৎকার করে ভিড় জমানো বা চড় থাপ্পড় দেওয়ার পরিবর্তে চোখের ইশারায় বা প্রয়োজনে অপরাধীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছে, হাত-টান স্বভাব ভাল নয়। দরকার হলে চেয়ে নাও। আমি এমনিই দোব।

হয়ত পাশে দাঁড়িয়ে কেউ সেটা শুনেছে। তারপর মুখ ফেরতা হয়ে পোঁচের ওপর পোঁচ রঙ চড়ে সে গল্প হাটের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। দুলাল যে নির্বিরোধ শান্ত মানুষ সে ধারণাটা তো আর এমনি এমনি তৈরী হয়নি!

প্রতি রোববারের মতো আজও দুলাল অন্যদিনের চেয়ে সকাল করে দোকান খুলেছে। কেনাবেচা চলছে। দুজন কর্মচারীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়সে ছোট ছেলেটিকে এক ফাঁকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়েছে। তিনজনের জলখাবার নিয়ে আসবে সে। অন্য কর্মচারীটির সঙ্গে দুলাল নিজেও জিনিস ওজন করছে, আবার ক্যাশ বাক্স সামলাচ্ছে। এর মধ্যেই 'জয় গুরু' এবং 'হরে কৃষ্ণ' আওয়াজ তুলে দুজন ভিখারী এল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে প্রথমে খয়েরী রংয়ের গাভীটি এবং তারপরেই সাদা কালো ডোরা কুকুরটি এল। দুলাল তাদের প্রাপ্য আহার্য দিল এবং প্রতিদিনের মতো ঘাড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিল।

হাটের সীমানা যেন প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারধারেই বিস্তৃত হচ্ছে। বিশালাক্ষী মন্দির থেকে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী পর্যন্ত এই পথটুকু, বাস লরিগুলি পনের বিশ মিনিট ধরে শামুকের গতিতে এগোয় আর তীব্র স্বরে হর্ণ বাজায়। ভঁস ভঁস করে কালো ধোঁওয়া ছাড়ে।

ছুটির দিনের হাটে শাক সব্জি হাঁড়ি কলসি থেকে জড়িবুটি, ভাগ্যগণনা, দাঁত তোলা এবং বাঁধানো এইরকম বিবিধ আয়োজনের মধ্যে ভিড়ের মানুষজনও রকমারী। বারমুডা, পাজামা পাঞ্জাবী, হেঁটো ধুতি, ছেলে কোলে আদুল গায়ে যুবতী বউ, দশ হাত কাপড়ে যার সারা অঙ্গ ঢাকে না ভালভাবে।

বাবু শ্রেণীর ক্রেতারা জিনিসপত্র কেনে, আবার ঘাড় ঘুরিয়ে মানুষও দেখে। টুকরো মন্তব্যও করে কেউ কেউ।

কী খেতে পায় বলুন? অথচ ফেমিনাইন অর্নামেন্টস্ সো চার্মিং অ্যান্ড লুক্রেটিভ।

পাশেরজন গম্ভীর গলায় উত্তর দেয়, তাহলেও বার্থ কন্ট্রোল ইমিডিয়েট নীড। তা না হলে ভবিষ্যতে এই বাচ্চাগুলোই পাকা ড্যাকোয়েট হবে। তখন আপনাকে আমাকে

এদের মোকাবিলা করতে হবে।

রোদ ঝলমলে আকাশ। তার ওপর অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। মনোরম প্রকৃতি বলতে যেমনটি বোঝায়। হাট সরগরম। লোকের ভিড়, তাদের কথাবার্তা, হাসির আওয়াজ, থেমে যাওয়া বাস লরির কান ফাটানো হর্ণের শব্দ।

আচমকা এসব কিছুকে ছাপিয়ে বিকট শব্দে তিনটি বোমা ফাটল দুম দুম করে। মুহূর্তে এলোমেলো ছুটোছুটি। লণ্ডভণ্ড জিনিসপত্র, সাইকেল রিক্সার ঠোকাঠুকি। হুড়মুড়িয়ে সাটার টানতে ব্যস্ত দোকানীরা। ছোটখাট কয়েকজন সবজিওয়ালা দু হাতে আঁকড়ে ধরেছে আনাজের ঝুড়ি বস্তা।

দুলালের দোকানে যে দু চারজন খদ্দের ছিল, তারা উধাও। ব্যাপারটা কী দেখার জন্য দোকান ঘর ছেড়ে বাইরে আসতেই লাল গেঞ্জি গায়ে ঝাঁকড়া চুলের রোগা চেহারার কম বয়সী একটি ছেলে দুলালের বুকে কালো একটি পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, ভেতর থেকে ক্যাশ বাক্সটা নিয়ে আয়।

দুলাল হতভম্বের মতো বলল, ক্যাশ বাক্স? কেন?

— কেন কি রে বে? ছেলেটি পিস্তলের ডগাটি দিয়ে দুলালের বুকে ঠেলা দিল, যা বলছি জলদি কর। তা না হলে মায়ের পেসাদ করে দোব এক্ষুনি।

দুলাল ফ্যালফেলে চোখে সামনের দিকে তাকাল। অমন গিজগিজে লোকের ভিড় ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেছে। সামান্য দূরে চালের আড়তদার বিশু হালদার দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে। মাঝবয়সী দুটি ছেলে, তাদের মধ্যে একজনের চোখে কালো চশমা মাথায় টাক, এক হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে অন্য হাতে ক্যাশ বাক্সের ডালা তুলে ধরেছে। অন্য ছেলেটি দু হাত ভরে টাকা পয়সা চটের ব্যাগে ভরছে। ভিড় ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় থেমে থাকা বাস লরিগুলি কোন ফাঁকে ছুট লাগিয়েছে। মাংসের দোকানের সামনে ছাল চামড়াবিহীন দুটি খাসি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। জালের খাঁচার মধ্যে বন্দী মুরগীর দল ডানা ঝাপটাচ্ছে। আর্তনাদের সুরে ডাকাডাকি করছে।

দুলাল কিন্তু দোকান ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। সাপের উদ্ধত ফণার মতো পিস্তলের শীতল কঠিন মুখটি তার বুক ছুঁয়ে আছে।

দুলাল মিনমিন করে বলল, এটা কি ঠিক কাজ হচ্ছে, ভাই?

— চোপ। রোগা চেহারার ছেলেটা গর্জে উঠল, কথা না বাড়িয়ে সরে দাঁড়া।

— এটা তো জুলুম করা হচ্ছে। তুমি আমার ছেলের মতো। বলো না ......!

দুলালের কথা শেষ হওয়ার আগেই পিস্তলধারী তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কে আমার মায়ের নাঙ রে?

শেষের শব্দ দুটি শুনেই দুলালের শরীরের মধ্যে রাগ ঘৃণা বিদ্বেষ সব মিলেমিশে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এল। রগের শিরা দপদপিয়ে উঠল। দরজা ছেড়ে সামান্য সরে গিয়ে দুলাল তার দেহের যত শক্তি ছিল সব জড়ো

করে সপাটে এক ঘুঁসি চালাল ছেলেটির মুখ লক্ষ্য করে। আঘাতটি এমনই অপ্রত্যাশিত এবং এতটাই প্রবল যে ছেলেটি ঘুঁসির ধাক্কা সামলাতে না পেরে দরজায় ঠোক্কর খেয়ে ঘাড় মুখ গুঁজরে পড়ল। তার হাত ফস্কে পিস্তলটি ছিটকে পড়ল। আর দুলাল কৈশোরে যেভাবে ভাঙ্গা তালগাছের মাথা থেকে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিত, অবিকল সেই ভঙ্গিতে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলটি খামচে ধরল।

জীবনে এই প্রথম তার হাতে অস্ত্র ধরা। কিন্তু সে একটুও ঘাবড়াল না। মাটি থেকে সটান উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের মুখটি ছেলেটির দিকে ঘুরিয়ে ধরে প্রথমে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, এইবার? এইবার কী হবে? তারপর দুহাতে পিস্তলটি সাপটে ধরে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ডাকাত, ডাকাত।

আর আশ্চর্য, দুলালের 'ডাকাত ডাকাত' ডাক মিলিয়ে যাবার আগেই গোটা হাট জুড়ে ডাক উঠল, ডাকাত পড়েছে। ডাকাত। ডাকাত।

দুম দুম শব্দে আবার দুটি বোম পড়ল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠল। ব্যাস্, ওই অব্দি। দুলাল দেখল পিল পিল করে মানুষ ছুটে আসছে তার দোকানের দিকে। তাদের কারোর হাতে লাঠি। কারোর হাতে আধলা ইট। লোহার বাটখারা।

উত্তেজিত মানুষ দুলালকে ঠেলে সরিয়ে দোকানে ঢুকতে চাইছে। দুলালের হাতে ধরা পিস্তলটি অল্প অল্প কাঁপছে। ধাক্কাধাক্কি বা ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে অসতর্কতায় দরজার কোণায় বা অন্য কোথাও লেগে তার ডান ভ্রূর ওপরের অংশে কেটে গেছে। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে। ঠোঁটের পাশে জিভ বুলিয়ে দুলাল রক্তের নোনা স্বাদ পেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকে হতচকিত হয়ে পড়ে। মূর্ছাও যায় কেউ কেউ। দুলালের কিন্তু এর কোনটাই হল না। বরং সে বেশ গম্ভীর গলায় আদেশের সুরে বলল, আগে থানায় খবর দাও।

তারপর নিজের হাতে ধরা পিস্তলটি এবং মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা লাল গেঞ্জি ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না। তাতে আমাদের সকলের বিপদ বাড়বে।

দুলালের কথায় মারমুখী টগবগে মানুষগুলি থমকে দাঁড়াল।

চার

অল্প সময়ের মধ্যেই পেঁজা তুলোর মতো উড়তে উড়তে দুলালের দুঃসাহসিকতার গল্প ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তার বাড়িতেও খবর পৌঁছে গেল।

থানা পুলিশের হ্যাপা মিটিয়ে দুলাল যখন কর্মচারীটিকে পাশে বসিয়ে রিক্সায় চড়ে বাড়ি ফিরল, তখন তার বাড়ির সামনেও ছোটখাটো জটলা।

রিক্সা থেকে নেমে দুলাল চারপাশে তাকিয়ে যেন 'এমন কী হয়েছে' এমনি ভঙ্গিতে তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটু থেমে বাড়ির

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কী এমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে যে সব কেঁদে ভাসাচ্ছ?

দুলাল চেরা চোখে দেখে নিয়েছে যে তার স্ত্রীর দু চোখে জল টলটল করছে।

— হ্যাঁগো, তোমার খুব লেগেছে? স্ত্রীর জড়ানো গলায় অস্ফুট প্রশ্নের জবাবে দুলাল এমনভাবে বলল, দূর! ছাড়ো তো! যেন এ ধরণের ঘটনা তার জীবনে আজ প্রথম নয়। হামেশাই ঘটে।

এরপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। সন্ধ্যা হল। দুলাল লক্ষ্য করল তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে তাকে লুকিয়ে চুরিয়ে এমনভাবে দেখছে যেন এ বাড়িতে সে একজন আগন্তুক। কপালে ব্যান্ডেজ এবং লাল চোখ দুটির জন্যই কি তাকে অচেনা কোন মানুষের মতো দেখতে লাগছে? দুলাল ভাবল আয়নায় নিজেকে দেখে একবার। কিন্তু মাথাটা অল্প ভার ভার এবং সারা শরীর জুড়ে জ্বর আসার আগের মতো ম্যাজম্যাজানির জন্য সে চোখ বন্ধ করে বুকের পর হাত দুটি জড়ো করে চুপ করে শুয়ে রইল।

প্রতি রাতের মতোই দুলাল বিছানায় বসে বীজমন্ত্র জপ এবং গুরুপ্রণাম শেষ করল। তার স্ত্রী ঘরের বড় আলো নিভিয়ে নাইট বাল্ব জালল। ফ্যানের গতি বাড়াল রেগুলেটার ঘুরিয়ে। মশারির মধ্যে ঢুকে বিছানার চাদর টানটান করল। দু পাশে চাপ দিয়ে মাথার বালিশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিল।

অন্যদিন দুলাল একলাই শোয়। মা আর দুই ছেলেমেয়ে পাশের ঘরে শোয়। আজ তার স্ত্রী নিতান্ত জেদাজেদি করে তার পাশটিতে শুতে এসেছে। বলা যায় না হঠাৎ করে যদি দুলালের শরীর খারাপ করে! জ্বর আসে হু হু করে!

বহুদিন পরে স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে। দুলালের অস্বস্তি হচ্ছে। হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস তার। আজ কেমন জড়োসড়ো হয়ে শুতে হয়েছে।

বেশ অনেকক্ষণ দুজনেই নিশ্চুপ। শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। একসময় দুলালের স্ত্রী তার দিকে ফিরে কনুইয়ের ভারে নিজের মাথাটাকে একটু উঁচু করে তুলে ধরল, গুরুদেব রক্ষা করেছেন, বলো?

একটু চুপ করে থেকে বলল, যদি কিছু হয়ে যেত?

— কিছু মানে? দুলাল হাসল, গুলি চালানোর জন্যেও হিম্মতের দরকার হয়।

— সত্যি তোমার ভয় করেনি?

— ভয়? দুলাল এবার হেঃ হেঃ শব্দ করে হাসল, ভেতরের মানুষটা কি মরে গেছে. ভেবেছ?

— তার মানে? দুলালের স্ত্রী বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

— আরে বাবা! দুলাল যেন কোন গোপন রহস্যকে ভেঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করছে এমনি নরম তার গলার স্বর, মরার আগেই যে মরে যায়, সে ব্যাটা তো ছাগলেরও অধম। দেখোনি, হুশ করে তাড়া দিলেই ছাগল ভয়ে নাদতে নাদতে ছোটে ?

— যাই বলো বাপু! দুলালের স্ত্রী মাথা নেড়ে বলল, মাথার ওপর গুরুদেব ছিলেন বলেই সব দিক রক্ষে হয়েছে।

দুলাল এ কথার কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। সামান্যক্ষণ পরে বেশ স্পষ্ট

গলায় বলল, ওসব তখন মাথায় ছিল না। একটু থেমে বলল, ঘুঁসিটা কিন্তু নিজের থেকেই মেরেছি। বেশ জোরেই মেরেছি।

— ছেলেটার যদি কিছু হয়ে যেত?

— হলে তো জানতেই পারতে। দুলাল নিস্পৃহ গলায় বলল।

— আমার সামনে কেউ বন্দুক হাতে দাঁড়ালে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

দুলাল বুঝতে পারল, এটা স্বামীর সাহসিকতার প্রচ্ছন্ন প্রশংসা। ব্যাপারটা আর একটু ভালভাবে যাচাই করার জন্য সে অবাক হওয়ার ভান করল, সত্যি অজ্ঞান হয়ে যেতে? কেন?

— ওঃ বাবা! দুলালের স্ত্রী দু চোখ বন্ধ করে এমনভাবে মাথা ঝাঁকাল যেন সত্যি সত্যি বন্দুকহাতে একজন দুষ্কৃতকারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্ত্রীর এই শরীরী ভঙ্গিমাটি দুলালকে তৃপ্তি দিল। তার গলায় শ্লাঘার সুর ফুটে উঠল, হাটের লোকজন বুঝেছে, দুলাল পালিত ঠাকুর পুজো করে, ভাই দাদা বলে কথা বলে, ঝগড়াঝাঁটি করে না, ঠাণ্ডা মানুষ, এটা যেমন সত্যি! বলে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, আবার অন্যায় জুলুম দেখলে প্রাণের মায়া ছেড়ে রুখে দাঁড়াতেও পারে।

নাইট বাল্বের স্বল্প আলোতে দুলাল এবং তার স্ত্রী কেউ কারোর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তবু অপলক দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রয়েছে।

একসময় দুলাল অনেক বছর আগের মতো তার স্ত্রীর গালে আস্তো করে হাত বুলিয়ে বলল, লতু, মাঝেমধ্যে একটু অন্যরকম ঘটা ভাল। তাতে, বাঁচার জন্য যে কী টান, সেটা বোঝা যায়। একটু চুপ করে থেকে বলল, সব চেয়ে বড় কথা কি জান, নিজেকে চেনা যায়। আমি কী পারি, আর কী পারি না!

এখন রাত কটা কে জানে! দেওয়াল ঘড়ির টকটক এবং একটা ঝিঁঝিঁ পোকার বিরামহীন ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মধ্যবয়সী একজন পুরুষ এবং একজন নারী, যারা দম্পতিও বটে, দুপাশে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রয়েছে। দুজনের কারোর চোখেই ঘুম নেই।

আর এদের দুজনের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে অদৃশ্য একজন।

তার নাম জীবন জিজ্ঞাসা অথবা পরবৈরাগ্য।

অমাবস্যার চাঁদ

আমার ঠাকুর্দার দূরদৃষ্টি ছিল। কারণ তাঁর ইচ্ছানুসারেই আমার বাবার নাম রাখা হয়েছিল কালীকৃষ্ণ। ঠাকুর্দা কিভাবে যে বুঝেছিলেন, পুত্রের নামের মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুধরণের দেবতার নাম পাশাপাশি থাকলে, তাঁর পুত্র চোর বদমাশ লম্পট ফেরেব্বাজ যাই হোক না কেন, কোনদিন কোন অবস্থাতেই নাস্তিক বা অধার্মিক হবে না।

আমার বাবা যে সময়ে কলেজে পড়াশুনা করেছেন; তখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন তুঙ্গে। কলেজ পড়ুয়া একজনও ছাত্র বা ছাত্রী ছিল না, যার রক্তে রাজনীতির ছোঁয়া লাগেনি। আমি শুনেছি সেই উত্তাল রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যেও, আমার বাবা আশ্চর্যরকম দক্ষতা এবং কৌশলে নিজেকে রাজনৈতিক উত্তাপের বাইরে রেখেছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময়েই বাবার উপনয়ন হয়েছিল। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিষেধাজ্ঞা মেনে। কত বছর হয়ে গেল, এখনও বাবা প্রতিদিন দুবেলা আহ্নিক করেন। বাথরুমে যাবার আগে কানে পৈতে জড়িয়ে নেন। প্রতি বছর চৈত্র মাস পড়তেই আগামী বছরের পঞ্জিকা কেনেন। বেণীমাধব শীলের।

আমার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। অফিসে বামপন্থী ইউনিয়নের সমর্থক। মিটিং মিছিলে যান না। কিন্তু ইউনিয়নের দাবি প্রতিবাদ ইত্যাদি সম্বলিত লিফলেট বাবার জামার পকেটে দেখেছি।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সারা দেশ জুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে, আমার বাবাকে দেখেছি, বেশ উত্তেজিত গলায় মা'কে বলতেন, একটা কেন, মুসলমানদের সব কটা মসজিদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত। ব্যাটারা আমাদের বুকের ওপর বসে আমাদের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়বে, আর আমরা তা মুখ বুজে মেনে নোব? কখ্খনো না। মাইক বাজিয়ে দিন পাঁচবার নামাজ পড়বে, তাতে শব্দ দূষণ হয় না! যত নিয়ম হিন্দুদের বেলায়! পুজোয় এত ডেসিবেলের বেশী জোরে মাইক বাজানো যাবে না, এত দিন ধরে রাস্তা জুড়ে ঠাকুর প্যাণ্ডেল রাখা যাবে না, চালাকি? মামার বাড়ির আব্দার?

এই জাতীয় রাগ এবং ক্ষোভ প্রকাশের সময় বাবাকে আমি এমন কথাও বলতে শুনেছি, তোমার আমার বেলায় দুটির বেশী একদম নয়। আর ও শালাদের হাঁসমুরগীর মতো পাল পাল বাচ্চা! বছরে বছরে বিয়োচ্ছে। খেয়ালখুশীমত বউ পাল্টাচ্ছে।

হয়ত আমি কিম্বা দিদি বা দুজনেই হাঁ করে বাবার মুখের দিকে চেয়ে এইসব কথাবার্তা শুনছি, এটা লক্ষ্য করেই মা শাসনের ভঙ্গিতে বাবাকে মৃদু ধমকে উঠেছে, কী হচ্ছেটা কী! ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। ওরা সব বুঝতে পারে।

এতে বাবা দ্বিগুণ উৎসাহ বোধ করে হাত পা নেড়ে চীৎকার করে উঠতেন, ওদের শেখাবার জন্যেই তো বলছি। এইভাবে নিজের ধর্মকে ছোট করে পৃথিবীর কোন জাত আজ অব্দি বড় হয়নি। হতে পারে না। চোরকে শাসন করার পরিবর্তে কেউ যদি তোয়াজ করে, তার ফল কী হতে পারে বল! বলে বাবা দুহাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে লবডঙ্কার ভঙ্গিতে দেখাতেন, রেজাল্ট প্লাস নয়। মাইনাস। চোর সাধু না হয়ে ডাকাত হবে।

— বুঝবে, বুঝবে। বাবার গলায় অনুতাপ ঝরে পড়ত, তোমার মেয়েকে ফুঁসলে নিয়ে যাবে, মাংসওলা নিজামুদ্দিনের ব্যাটা। আর তোমার ছেলের চোয়াল চেপে ধরে মুখের মধ্যে গরুর মাংস ঠেসে দেবে দর্জিপাড়ার মুসলমানেরা। মা শিউরে উঠে অজান্তেই বলে উঠেছে, আঃ!

বাবার মনে হয়েছে এতক্ষণে তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং বক্তব্যকে এসট্যাবলিস করতে পেরেছেন। অল্প ঘাড় নেড়ে শব্দহীন হেসেছেন। অনুচ্চ গলায় বলেছেন, আসছে, ভয় নেই, সেদিন আসছে, আর বেশী দেরী নেই।

এসব আজ থেকে দশ বছর আগের ঘটনা। এই দশ বছরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক ওলোটপালট হয়েছে। মৌলবাদীরা সংখ্যায় বেড়েছে। সন্ত্রাসবাদের দাপটও বেড়েছে। অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ভোল বদলেছে। এতদিন যাকে শোষক বলে ভাবা হোত, এখন সে ত্রাতার ভূমিকায়। আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা প্রতিদিন ক্ষয়ে যাচ্ছি একটু একটু করে। অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার ডামাডোলের মধ্যেও আমার বাবার ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গায় এতটুকু টোল পড়েনি। পড়েনি বলছি এই কারণে যে ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে, যা, বাবা বাদে বাড়ির অন্যদের ভাবনা চিন্তায় গভীর ছাপ ফেলেছে। বিশেষ করে আমি এবং মা দুজনেই, 'ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়' বা 'ঈশ্বর সব দেখেন। তাঁর বিচারে কোন ভুল নেই', এই জাতীয় কথাগুলিকে সুবিধাবাদীদের মনগড়া এবং নিছক স্তোকবাক্য ছাড়া অন্য কোনভাবে মানতে পারি না।

কলেজে ভর্তির পরেই আমার দিদির মধ্যে উড়ু উড়ু ভাব আসে। পড়াশুনার পরিবর্তে প্রেম করার ব্যাপারে দিদি অল্পদিনের মধ্যেই শহরের একটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে। নিত্যনতুন প্রেমিক পাল্টাতে পাল্টাতে শেষমেশে সুদর্শন একটি কাবুলী ছেলের সঙ্গে পাড়া শহর এমনকি দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে গেল। স্থানীয় কয়েকটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে দিদির পালিয়ে যাওয়ার খবর ছাপা হল। তারপর কলকাতার একটি নামী দৈনিকে 'মরু হৃদয়ে সবুজ বনানী' এই শিরোণামে দিদি এবং তার কাবুলি প্রেমিকের প্রেমপর্ব বিবাহপর্ব প্রস্থানপর্ব ধারাবাহিক ছাপা হল। লজ্জায় আমাদের পরিবারের সকলের মাথা হেঁট হয়ে গেল। কয়েকজন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ঘুরতে ফিরতে মা বিড়বিড় করে একটি কথাই বলতে লাগল, ঠাকুর, তুমি এ কী করলে? এ তোমার কেমন বিচার?

মায়ের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, ঈশ্বরের বিচারের দাঁড়িপাল্লায় পাষাণ চাপানো আছে। তা না হলে আমাদের এমন ঘোর দুর্দিন আসবে কেন! আমার বাবা শিশুর খাদ্যে ভেজাল মেশান না। জাল ওষুধের ব্যবসা করেন না। রাজনীতিকদের মতো ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে কথা বলেন না। চাকুরি দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকার যুবকের অর্থ আত্মসাৎ করেন না। তিনি সাদামাটা একজন সরকারী কর্মচারী। এত বড় লজ্জার মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে কেন?

সংবাদপত্র পড়ে জেনেছি কাবুলে আমার দিদি ঘোরতর কষ্টের মধ্যে বন্দিনীর জীবন কাটায়। সেখানে তার স্বামীর বিয়ে করা আফগান বউ এবং তার তিন ছেলে আছে। দিদি নাকি কয়েকবার পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। প্রতিবারই স্বামীর হাতে খুন হতে হতে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। তারপর পালানোর চিন্তা ছেড়ে সতীন আর তার ছেলেদের নিয়ে ঘর করছে। দিদির নিজেরও নাকি একটি মেয়ে হয়েছে। তাকে দেখতে কেমন হয়েছে, কত বড় হল, এসব আমরা কিছুই জানি না। দিদির নাম আমাদের বাড়িতে ভুলেও কেউ উচ্চারণ করে না।

কিন্তু এত সবের পরেও আমার বাবা দুবেলা আহ্নিক করেন। আহ্নিক শেষে পুজোর আসন, গঙ্গাজলের ঘটি, ধূপদানি ইত্যাদি গোছাতে গোছাতে স্বগতোক্তি করেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়। তাঁর কাজের বিচার করার, আমি কে?

দ্বিতীয় ঘটনাটি একান্তভাবেই আমাদের পারিবারিক ঘটনা। এর সঙ্গে অন্য কারোর কোন সংস্রব নেই। কিন্তু এটি এমনই বেদনাদায়ক যা একজন খুনী বা বিবেকহীন মানুষের ক্ষেত্রেও কষ্টদায়ক, অসহনীয় বোঝার মতো।

দিদির পরে আমি। আমার চেয়ে প্রায় চার বছরের ছোট একটি বোন আছে। এই বোনটিকে আমি একসময় কোলে শুইয়ে আদর করেছি। টলমল পায়ে সে যখন হাঁটত, আমি তার হাত ধরে থাকতাম শক্ত করে। দু বছর বয়সে বোনটির কী যেন এক কঠিন অসুখ হল, তার হাত এবং পাগুলি সরু হয়ে যেতে লাগল। 'বাপা' 'দাতা' এইসব উচ্চারণ করতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে যেতে লাগল। জোর করে হাঁটাতেগেলে কষ্টে তার চোখমুখ বেঁকে যেতে লাগল। গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগল। ডাক্তারবাবু বললেন, হাঁটাবার চেষ্টা করবেন না। ওর কষ্ট হয়। ওকে শুইয়ের রাখবেন।

সেই থেকে আমার বোনটি আজও দিনরাত শুয়েই থাকে। অসময়েই তার বুক দুটি বড় হতে শুরু করল এবং এখন সে দুটি বয়স্ক মেয়েমানুষের মতো বেঢপ এবং ঝোলা প্রকৃতির। পেটটিও আনাজের ঝুড়ির মতো উঁচু। দেহের তুলনায় মাথাটি বড়। সেকেলে দেওয়াল ঘড়ির মতো চৌকো মুখ। চোখদুটি এমন বড় মাপের, মনে হয় যেন কুঠুরি ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখ দিয়ে সবসময়েই লালা এবং থুথু গড়িয়ে পড়ে চিবুক গলা বেয়ে। থুথু জমে জমে ঠোঁটের দুটি কোণে দুটি জমাট সাদা ড্যালা। চিবুকে লালার রসের চাঙ্গড় ঝোলে সব সময়ে।

প্রায় অন্ধকার একটি ঘরে মেঝের বিছানায় আমার বোন দিনরাত শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়েই খায়। পেচ্ছাব পায়খানা করে। খিদে পেলে বা কোন কারণে খুশি হলে মুখ দিয়ে বিকট গোঁ গোঁ শব্দ করে। একমাত্র মা'ই বুঝতে পারে বোনের ডাকের কারণ। মা যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে। বোনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সুর করে নামতা পড়ার মতো করে, কী হয়েছে সোনা? কী খাবে মণি? ও বাবা! তাই নাকি! তোমার হাসি পাচ্ছে! আনন্দ হচ্ছে! এই সব বলে।

আমি বা বাবা কেউই বোনের কাছে যাই না। কারণ ওর পরণের ঢোলা ম্যাক্সিটার বুকের বোতাম নেই। অনেক সময়েই ম্যাক্সিটি কুণ্ডুলী পাকিয়ে পেটের কাছে রেখে দেয় মা। পেচ্ছাব পেলে ও বলতে পারে না। শিশুর মতো সব ভিজিয়ে ফেলে। ওর ব্যবহারের জন্য তিন চারটি চটের বস্তা, মায়ের পুরনো শাড়ি এবং ছেঁড়া সায়া রাখা আছে। ঘরের মধ্যেটা পেচ্ছাবের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা। গা গুলিয়ে ওঠে। আশ্চর্য এই ঘরের মধ্যেই মা বোনের পাশে বিছানা পেতে রাতের বেলায় শোয়।

তার চেয়েও আশ্চর্য, আমার এই পঙ্গু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বোনটির নাম কুসুম। কুসুম মানে তো ফুল। যে কোন ফুলকে মানুষ ভালবাসে। হয় তার গন্ধের জন্য, তা না হলে রূপের জন্য। আমার এই বোনকে কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ভাল লাগার কথা নয়। তবু ওর নাম কুসুম রাখা হল কেন?

মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে মিনমিন স্বরে বলেছিল, জন্ম থেকেই তো ও এরকম ছিল না। ডাক্তার বদ্যিও তো কম করা হয়নি। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তোর বাবার কথাই ঠিক। সবই আমাদের ভাগ্যের লিখন।

মায়ের কথার মধ্যে মিথ্যে নেই। কেবলমাত্র বাবার উক্তিটুকু ছাড়া। বাবা তাঁর আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব, বোনের চিকিৎসার জন্য তা করেছেন। প্রভাবশালী একজন রাজনীতিকের রেফারেন্সে বোনকে নিয়ে ভেলোরেও গেছিলেন। বাবা মা দুজনেই। সেখানে সবচেয়ে নামকরা ডাক্তারকে দেখিয়েছেন। কটেজ ভাড়া করে মাসখানেকের মতো ভেলোরে ছিলেনও। বোনের আদ্যন্ত চেক আপ হয়েছিল। কয়েকজন নামী ডাক্তার মিলে মেডিকেল বোর্ডও বসেছিল। কিন্তু ফিরে আসার পর দেখা গেল, বোনের শারীরিক অবস্থার একটুও পরিবর্তন হয়নি। ভেলোরে সবচেয়ে নামী ডাক্তার যিনি আমার বোনকে ফাইনাল চেকআপ করেছিলেন, তাঁর নাম অ্যান্ড্রু হ্যারিসন। শেষ দিনে তিনি নাকি ওপর পানে আঙ্গুল তুলে বলেছিলেন, প্রে টু গড ফর হার আর্লি ডেথ।

বাবা ডাক্তারবাবুর কথার মানে বুঝতে পেরেছিলেন। মা সেকেলে খুবই অল্প শিক্ষিত মানুষ। মায়ের ধারণা হয়েছিল, ডাক্তারবাবু চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ওপরওলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখার কথা বলেছিলেন।

বড় ডাক্তারের ওষুধের গুণে এবং ঈশ্বরের কৃপায় কুসুম তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে এমন ধারণায় আমার মা যখন স্বস্তি এবং উৎফুল্ল বোধ করছে, আমার বাবার চোখমুখে তখন প্রতিদিন ক্লান্তির ছাপ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। লক্ষ্য করতাম বাবার পুজোর সময় একটু একটু করে বাড়ছে এবং আমি বা মা তাঁর চোখের সামনে নেই এমনি মুহূর্তে বিড়বিড় করে আপন মনে কী সব বলছেন, আর বলার ফাঁকে ফাঁকে কপালে হাত ছোঁয়াচ্ছেন। একদিন এইরকম এক মুহূর্তে বাবার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হওয়া মাত্রই বাবা খুব ঘাবড়ে গেলেন। অপরাধী ধরা পড়ে গেলে তার কথাবার্তা যেমন জড়িয়ে যায়, অবিকল সেইভাবে আমার দিকে চেয়ে হাসার চেষ্টা করলেন, তোর কলেজ আজ ছুটি? আমি বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। আসলে বাবা নিজেকে আড়াল করতে চাইছেন। আমি প্রথমে ঘাড় নেড়ে বললাম, না, ছুটি নয়। দেরীতে ক্লাস।

তারপর যেন বাবার প্রশ্নে খুব রেগে গেছি, বিরক্ত বোধ করছি, এমনি গলায় বললাম, সব সময়ে বিড়বিড় করে কী বল? বারবার কপালে হাত ছোঁয়াও কেন? একটু থেমে বললাম, লোকে তোমায় ম্যানিয়াক বলবে। আড়ালে হাসিঠাট্টা করবে।

আমার কথায় বাবার মুখে মেঘের ছায়া নেমে এল। হাতের ইশারায় আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, আমাদের সামনের দিনগুলো বড় দুঃখের, পল্লব।

আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। মনে হল বাবার কর্মস্থলে নিশ্চয়ই এমন কোন সংকেত এসে পৌঁচেছে, যাতে কাল পরশু বা তারপরের যে কোন দিনে, তাঁর সাতাশ বছরের কর্মজীবনে এক আঁচড়ে 'না'-এর ঢ্যাঁড়া পড়ে যেতে পারে। সরকারের জনমুখী আর্থিক নীতির প্রয়োগে এখন 'সুস্থির' বা 'পাকা' বলে কোন শব্দ নেই। এখন প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই। রাজনীতিবিদদের মতে এটা বিশ্বায়নের যুগ। তীব্র প্রতিযোগিতা যার প্রথম এবং প্রধান শর্ত।

আমি ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অফিসে কি কোন সার্কুলার এসেছে? ভি. আর. এস. নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে?

বাবা আস্তো ঘাড় নাড়লেন, না ওসব কিছু নয়। আসলে! বলে খুব করুণ চোখে আমার মুখের পানে তাকালেন, তোর মাকে যে সত্যি কথাটা কিছুতেই বলতে পারছি না।

— কী কথা? আমার নিজের গলা কেঁপে উঠল।

— ভেলোরের ডাক্তারবাবু বলেছেন কুসুমের দ্রুত মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে। তাতেই ওর মঙ্গল হবে। ভাল হবে।

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, করুণাময়ের ইচ্ছাও বুঝি সেরকমই। দেখছিস না, কুসুমের অবস্থা কেমন ডেটোরিয়েট করছে।

বাবার মতো আমিও জানি কুসুমের মৃত্যু হবে অসময়ে এবং দুঃসহ কষ্টের মধ্যে

দিয়ে। এটাও মানি কুসুমের এভাবে বেঁচে থাকাটাকে কোনমতেই বাঁচা বলে না। যে কোন বাবা মায়ের পক্ষে তাদের সন্তানের এমন নিদারুণ অবস্থা রোজ রোজ চোখে দেখা কষ্টের। সহ্য করা অসহনীয়। কিন্তু এতসবের পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হল, প্রাণের অস্তিত্ব। মূক বধির জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শক্তিহীন, যাই হোক না কেন, এখনও কুসুমের হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করে, সে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়, আমার বাবা মায়ের কাছে এটাই চরম সান্ত্বনার। আমি অনেকবার, কখনও মা'কে, কখনও বাবাকে বলতে শুনেছি, তিন ছেলেমেয়ে। বড় মেয়ে। তারপরে ছেলে। তার নিচে আর এক মেয়ে।

আমার নিজের বুক খালি করে লম্বা একটা শ্বাস বেড়িয়ে এল। আস্তে করে বললাম, মাকে না বলে ভালই করেছো।

— সত্যি কথাটা বুকে চেপে রেখে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। বাবা মৃদু স্বরে বললেন, আজ তোকে বলে একটু হালকা হলাম। প্রভুর ইচ্ছেয় এখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি ঘটে যায়, সেটাই ভাল। তাই না? হয়ত এর পরের জন্মে কুসুম ফুলের মতো সুন্দর সুস্থ একটা জীবন পাবে।

কথা বলতে বলতে বাবা আমার পাশ দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

— শোন। আমি ডাকলাম, ডাক্তার যখন 'না' বলেছে, তখন কিছুই করার নেই। তবে এখন থেকে দয়া করে ঈশ্বর, পুনর্জন্ম এগুলো ছাড়ো।

হঠাৎই আমার গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠল, ঈশ্বর বলে যদি সত্যি কিছু থাকতো; আর তার ন্যায় অন্যায় বিচার করার সঠিক ক্ষমতা থাকতো, তাহলে চোর বদমাইশ খুনে ডাকাতগুলো দিব্যি খেয়ে পরে নেচেকুঁদে জীবন কাটাতে পারতো না।

আমার কথার উত্তরে বাবা মুচকি হাসলেন। আমার পিঠে হাত রেখে থেমে থেমে বললেন, কলেজে পলিটিক্স কর বুঝি? রাজনীতিবিদরা ফলোয়ারদের মুখে যা বলে, ব্যক্তিগত জীবনে নিজেরা তা পালন করে ন। খোঁজ নিয়ে দেখো, তাদের বাড়ির মেয়ে বউরা কালী দুর্গা শেতলা থেকে শুরু করে সন্তোষী শনি পর্যন্ত পুজো করে। নেতাদের হাতের আঙ্গুলে গোমেদ পলা নীলা সব দেখতে পাবে। একটু ভাল করে লক্ষ্য কোর, অনেক নেতারই জামার আড়ালে বুকে মাদুলি, হাতে তাবিজ আছে।

বাবা যেন মাস্টারমশাই। আর আমি একটি নির্বোধ ছাত্র। ধরে ধরে সব বোঝাচ্ছেন। বেশ রাগ হল, কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছ?

— ঠিকই যাচ্ছি। বাবা ঘাড় নেড়ে বললেন, ঈশ্বরের মহিমা বোঝার ক্ষমতা সকলের থাকে না। আবার এটাও জেনো, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটি পাতাও নড়ে না।

দিন কেটে যায়। বাবা অফিস করেন। বাড়ির অন্যান্য কাজ করেন। আবার দু'বেলার আহ্নিকও করেন এবং আগের মতই আপন মনে অনুচ্চ স্বরে ঈশ্বরের কাছে কুসুমের দ্রুত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেন।

মাকে আগের চেয়ে একটু বেশী সজীব মনে হয়। প্রায়ই আমাকে বলেন, আজ কুসুম

নিজে থেকে আমার আঁচল ধরে টানল। বা কাল রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার গলার ওপর কুসুমের হাত। আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। আগের চেয়ে খিদেও বেড়েছে। প্রতি কথার শেষে মা কপালে হাত ছোঁয়ায়। আর যখন দেখে আমি কোন কথারই জবাব দিচ্ছি না, তখন বেশ রাগত গলায় বলে, তুই তো আবার ভগবান টগবান মানিস না। ঈশ্বরের দয়ায় খোঁড়া মানুষও পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে যায়।

আমি যদি হেসে বলি, সেটা তার মনের জোর। প্রবল ইচ্ছাশক্তি।

— জানবি, সেটাও ঈশ্বরের দান। মা চটপট জবাব দেয়।

আমি আর কথা বাড়াই না।

ইতিমধ্যে আমার বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্ট বেরোতে এখনও মাস তিনেক দেরী। কম্পিউটারে ভর্তি হয়েছি। এখন বড় হয়েছি। হাত খরচের জন্য কিছু টাকা পয়সার দরকার হয়। আমার দু একজন বন্ধু খবরের কাগজ বিলি, মাদার ডেয়ারীর দুধ দেওয়ার কাজ করে। তারা আমায় বোঝাল, যদ্দিন না চাকরি বাকরি কিছু পাচ্ছিস এ ধরণের কাজে নিজের পকেটমানিটুকু উঠে আসে। আবার এ ধরণের কাজ করতে করতে নাকি অনেক সময়েই ব্যবসার চ্যানেল খুঁজে পাওয়া যায়। দুচারজন বয়স্ক মানুষ বোঝালেন, মটর গ্যারেজে কাজ শিখতে। খেটে খাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। মেকানিক হতে পারলে, ভবিষ্যতে না খেয়ে মরতে হবে না।

এইসব বুদ্ধি পরামর্শের মধ্যে আমি কোন সারবত্তা বা সত্যতা খুঁজে পেলাম না। কোনরকম উৎসাহ বোধ করলাম না। কিন্তু কেউ আমায় ওয়াগান ব্রেকার বা পকেটমার হওয়ার পরামর্শ দিল না। মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ জাতীয় কিছু হতে পারলে, সত্যি হয়ত আমার কপাল খুলে যেত।

শেষমেশ অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি একজন রাজনীতিক দাদার ফলোয়ার হলাম। আমি তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করে অল্প দিনের মধ্যেই দাদার ব্যক্তিগত কাজকর্ম করার দায়িত্ব পেলাম। দাদা প্রভাবশালী রাজনীতিক। সামনের ইলেকশনে জিতলে মন্ত্রী হবেনই। তখন আমার একটা চাকরি পাকা। এ দল সে দল করতে করতে দাদা আমার এতটাই অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন যে ভোটের হাওয়া বুঝে নিয়ে ঝুপ করে শিবির বদল করেন। এভাবেই বিগত তিনটি ইলেকশনে জিতে এসেছেন। আমার দেখা বাস্তব অভিজ্ঞ মানুষ হিসেবে দাদা অতুলনীয়। দাদার কাছাকাছি আসার সুবাদে অনেক ধরণের মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আমার বয়সী কয়েকজন তো রীতিমত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। যদিও জানি আমরা কেউ কাউকে মনের গোপন কথাটি বলি না এবং সুযোগ পেলেই একজনের অবর্তমানে তার সম্পর্কে হাল্কা করে অভিযোগ করে, দাদার কানভারি করার চেষ্টা করি।

আমার এইসব রাজনীতিক বন্ধুদের কয়েকজন আমার বাড়িতে এসেছে কয়েকদিন। মা তাদের যত্ন করে চা খাইয়েছে। তারা আমার মুখে কুসুমের গল্প শুনেছে। 'ইস', 'স্যাড' এ ধরণের বিলাপও করেছে।

একটি ছুটির দিনে, বাবা তখন বাড়িতে, আমার এইসব বন্ধুদের তিন চারজন এসেছিল। বাবার সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বোনের সেরে ওঠার সম্পর্কে তারা বাবাকে নানারকম খোঁজখবর দিয়েছিল। তার মধ্যে ডাক্তার হসপিটাল এসবও যেমন ছিল, আবার মাদুলি কবচ ঠাকুর মন্দির এবং পীরের দরগার মিরাকিল ঘটনার কথাও ছিল।

বন্ধুরা চলে যাবার পর বাবাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। আমাকে বললেন, ছেলেগুলো অনেক খোঁজখবর রাখে। তবে হিন্দুর ছেলে পীরবাবার মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে, এটা মানা যায় না। একটু থেমে বললেন, ও হয়ত কারোর মুখে শুনে থাকবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে বলছিল না, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। লক্ষ্য করেছিস, কথা বলার সময়ে ছেলেটা কেমন আমতা আমতা করছিল।

আমি বললাম, ও নিজে মুসলিম কিনা, তাই দরগা মাজার এ সবের ওপর ওর ভক্তি বিশ্বাস বেশী।

— মুসলিম? বলে বাবা পোড়খাওয়া পুলিশ অফিসারের মতো চোখমুখ কোঁচকালেন।

— হ্যাঁ। আমি বললাম, ওর নাম কামাল নাসের। একটু চুপ করে থেকে বললাম, কেন? কী হয়েছে?

— কিছু নয়। বাবা ঘাড় নেড়ে বললেন। তারপর বেশ শব্দ করে লম্বা একটা শ্বাস ফেললেন। মুখ দিয়ে জোরালো একটা আওয়াজ বেড়িয়ে এল তাঁর, হুম।

মন্দির মসজিদ বিতর্কে দেশ জুড়ে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে। অযোধ্যায় কট্টর হিন্দুবাদীরা রামলালার নামে যজ্ঞ শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজারে হাজারে করসেবক অযোধ্যায় জড়ো হচ্ছে। গুজরাটে সরকারী মদতে সংখ্যালঘু নিধন চলছে অবাধে। সংসদে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্বের স্বপক্ষে সদর্পে একজন সাংসদ বলছেন, সংখ্যাগুরুদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে সংখ্যালঘুদের থাকতে হবে এদেশে।

প্রতিটি দৈনিক কাগজের শিরোনামে অযোধ্যা, গুজরাট।

বেশ কয়েকদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি, আমার বাবা চায়ের কাপ হাতে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। পাঠে মনোযোগের কারণে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা চা সরবতের মতো করে এক ঢোঁকে গিলে নিয়ে, বাবা মাকে ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, বুঝলে! ও শালাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

মা অবাক গলায় বলল, কী বলছ? কাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে?

— কাদের আবার? বাবা ধমকে উঠলেন, মুসলমানদের। একটু থেমে বললেন, আমেরিকার হাতে অমন মার খেয়েও ব্যাটাদের শিক্ষা হয়নি। এখন আমাদেরও উচিত ওদের ধরে আচ্ছা করে কড়কে দেওয়া।

আমার মা অল্প শিক্ষিত। খবরের কাগজ পড়ে না। হিন্দু মুসলমানদের ধর্ম যে আলাদা শুধু এটুকু বোঝে। কিন্তু আমেরিকার হাতে মুসলমানরা কবে কোথায় মার খেল বা অযোধ্যা গুজরাটে কী ঘটছে, এসব সম্পর্কে আমার মা কিছুই জানে না। শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে মা মায়ের মতো করে জবাব দিল, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট করে কী লাভ বাপু? যে যা নিয়ে আছে, সেটা নিয়ে থাকলেই হয়।

— থাকতে দিচ্ছেটা কই? বাবাকে বেশ উত্তেজিত দেখাল, ওরা তো ভাবে পৃথিবীর সব লোককে মুসলমান হতে হবে। দ্যাখো না! ইসলামের নামে বিয়ে করে। আবার তালাকও দেয় ইসলামের নামে। যুদ্ধ করে, তাও ইসলামের দোহাই দিয়ে।

বাবা যখন রোয়াকে বসে এইসব কথাবার্তা বলছেন, আমি তখন সিঁড়ির নিচ থেকে সাইকেল বার করছিলাম। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আজ একটা সম্প্রীতি মিছিল হবে। মিছিলটিকে সাকসেসফুল করার জন্যে আমাকে বিশেষভাবে আলাদা কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন দাদা। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে শুনিয়েই বাবা মুসলমানদের বিপক্ষে এমন ঝাঁঝালো কথাবার্তা বলছেন। বাবা জানেন, আমি যে দলের কর্মী, মতাদর্শগতভাবে সেই দলটি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

উঠোনে সাইকেলটাকে স্ট্যান্ড দিয়ে রেখে আমি বাবার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকালাম, রাস্তাঘাটে চীৎকার করে এসব কথা বোল না। পাবলিক তোমায় হেনস্থা করবে।

— কেন? কেন? বাবা আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন, আমি কি ভুল বলছি? মিথ্যে বলছি? উত্তেজনায় বাবা অল্প অল্প হাঁফাচ্ছেন, তোমরা যারা এর বিরোধীতা করছ, তারাও তো রাজনীতি করছো? করছো না?

হঠাৎ কেমন রাগ হল বাবার ওপর। সাইকেলের স্ট্যান্ড তুলে সদর দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললাম, ভেতরে ভেতরে তুমি যে এতটা, জানতাম না! সদর পেরিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে শুনতে পেলাম, বাবা বীভৎস গলায় চীৎকার করছেন, কী করতে পেরেছিলে, তোমার দিদিকে যখন মুসলমান কাবলেটা নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেল?

ইচ্ছে হল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বাবার মতো চীৎকার করে আমিও বলি, দিদি নিজের ইচ্ছেয় বাড়ি ছেড়েছে। এর কারণও একটাই, তা হল. দিদিকে তুমিও ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারোনি।

মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে দেখি পথচলতি দুচারজন মানুষ এবং আশপাশের বাড়ির জানলা খুলে কয়েকজন আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে। সাতসকালে ব্যাপারটা কেমন নাটুকে হয়ে যাচ্ছে, এই ভেবে লজ্জা করতে লাগল। সিটের ধুলো ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে আমি প্যাডেলে চাপ দিলাম। তখনও বাবা সমানে চীৎকার করছেন, আজ থেকে পল্লবের একজন বন্ধুও যেন আমার বাড়িতে ঢুকতে না পারে। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি, দরকার হলে সদরে তালা মেরে রাখবে।

মা নিশ্চয়ই পাথরের মতো নিশ্চল নির্বাক, বাবার এমন ভয়ংকর রাগ দেখে, চুপ করে দাঁড়িয়ে বাবার আদেশ শুনছে।

আমাদের সম্প্রীতি মিছিল শহরের এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে অন্য প্রান্তে পৌঁছল যখন, তখন প্রায় মাঝ দুপুর। বাতাসে এখনও অল্প আমেজী ঠাণ্ডা ভাব বলে রোদ তেমন চড়া মনে হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও সকলেরই জামার পিঠ ভিজে গেছে।

— মিছিল দুর্দান্ত সফল। আমার কানের কাছে মুখ এনে দাদা ফিসফিস করে বললেন, দেশের এই অস্থির পরিস্থিতিতে এ মিছিলটার খুবই প্রয়োজন ছিল। তাই না?

আমি ঘাড় নেড়ে সমর্থন করায় দাদার গলায় আত্মতৃপ্তির সুর, বলতে পারো, এ অঞ্চলে আমিই প্রথম এ ধরণের মিছিল করলাম। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই, হিন্দু মুসলমান পাঞ্জাবী ওড়িয়া, সব ধর্মের মানুষ এসেছে যেমন, আবার তার পাশাপাশি রিক্সাওলা জনমজুর থেকে শুরু করে, কেরানী, টিচার, ডাক্তার, সুকুমার দেবের মতো নাট্যকার, হিমানীদির মতো গাইয়ে, এমনকি ফিজিকাল কালচার ক্লাবের মেম্বাররা পর্যন্ত, সব্বাই, সব্বাই এসেছে। আমি লক্ষ্য করলাম 'সব্বাই' শব্দটা দাদা দুবার উচ্চারণ করলেন এবং এই সময়ে তাঁর গলার স্বরও বেশ গাঢ় শোনাল।

এবারেও আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম, ঠিক বলেছেন।

দাদা আমাকে তাঁর একটু কাছে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, কালকের সব কাগজে আমাদের মিছিলটার কভারেজ থাকবে দেখো। সামনের ইলেকশনে এর একটা গুড ইমপ্যাক্ট পাওয়া যাবে। তাই না?

এবারও আমি ঘাড় নাড়লাম, নিশ্চয়ই।

— তবে হ্যাঁ, দাদা এবার বেশ গলা ছেড়ে বলে উঠলেন, কেবল মিছিল মিটিং করে এ বিপর্যয়কে ঠেকানো যাবে না। এর জন্য চাই সার্বিক জনচেতনা। তোমাদের! বলে আমার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যারা, তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে যেন নির্দেশ জারী করছেন এমনি ভঙ্গিতে আঙ্গুল নেড়ে বললেন, প্রত্যেককে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইটা শুরু করতে হবে গ্রাসরুট লেভেল থেকে। এখন থেকে প্রত্যেকের প্রাথমিক এবং প্রধান কাজ হল, নিজের বাড়ির লোকজনকে এ ব্যাপারে বোঝানো। কনভিন্স করা। জানবে চোরা স্রোতের মতো বিরুদ্ধপন্থীরাও আমাদের মধ্যেই আছে। হয়ত আমাদের অনেকের ফ্যামিলিতেও মৌলবাদে বিশ্বাসী দুএকজন মানুষ আছে। তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে ......!

মাউথপিসের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন মেয়ে এবং একজন ছেলে কোরাসে গান শুরু করেছে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু/....../যাত্রীরা হুঁশিয়ার ....../ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।

গুজরাট ছাড়িয়ে দাঙ্গার রেশ আরও কয়েকটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। এমনকি আমাদের রাজ্যেও কট্টর হিন্দুপন্থীদেব মিছিল আটকাতে পুলিশকে গুলি চালাতে হল।

তাতে একজন মারাও গেল।

দাদা প্রায়ই বলেন, ঘরে আগুন লাগলে কম বেশি তাপ সকলেরই গায়ে লাগে। যে ভাবে আমি বেশ আছে, এইভাবেই থাকব, সে বোকা।

আমাদের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সংহতি কমিটি তৈরী হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষজনকে বেশি বেশি করে আন্দোলনে সামিল করার জন্য আমরা পথসভা করছি। একটি পথনাটিকাও অভিনয় করছে আমাদের দলের কয়েকজন মিলে। এর বাইরেও পোস্টারিং, লিফলেট বিলি, এসব তো আছেই। প্রতিটি পথসভাতে বক্তারা বলেন, আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখনও অটুট। এ জোড়কে কখনও ভাঙ্গতে দেবেন না। চোখ কান খোলা রাখুন। অল্প সংখ্যক মানুষ যারা এর বিরোধীতা করছে, তাদের পালটা আঘাত করবেন না। যুক্তি দিয়ে কারণ দেখিয়ে তাদের বোঝান। কাছে টেনে আনুন। প্রতিটি পথসভাতেই প্রায় একই ধরণের বক্তব্য রাখা হয়। শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

আজ সন্ধ্যায় বাজারের মুখে আমাদের পথসভা চলছিল। ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। আমরা চটপট ইমারজেন্সি আলো জ্বেলে, ব্যাটারির সঙ্গে মাউথপিস জুড়ে দিলাম। খুবই অল্প সময় লাগল এই কাজগুলি করতে। বক্তা টুল থেকে নেমে পড়েছিলেন। অন্ধকারে কে ধাক্কা দেয়, কোথায় উল্টে পড়েন, এই ভয়ে। আমি মাউথপিসে মুখ রেখে বার কয়েক 'হ্যালো-হ্যালো' করে যখন ইশারায় বললাম, ও. কে., বক্তা সাবধানে টুলে উঠে দাঁড়ালেন। যত দূব বলেছিলেন, সেখান থেকে আর একটু পিছিয়ে গিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন। ভিড় হয়েছে ভালই। সভার শেষে পথনাটিকা হবে। ভিড় বেশি হওয়ার সেটাও একটা কারণ।

বক্তৃতা যখন মাঝবরাবব পৌচেছে, আলো চলে এল। অল্প সময়ের জন্য হলেও আবার একটু বিরতি। বক্তাকে ঘিরে আমরা কয়েকজন ছেলে ব্ল্যাক ক্যাটের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। আমাদের ঠিক পিছনেই ময়লা উপচে পড়া নর্দমা। হাওয়ায় গন্ধ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও মশাদের তাড়াতে পারছে না। আমাদের পায়ের অনাবৃত অংশে মশা কামড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে পা ঠুকে নিচ্ছি। কে যেন একবার বললও, মশা মারার কয়েল কিনে নিয়ে এসো। বক্তৃতা করতে দাদার অসুবিধা হচ্ছে। আমার পাশে নির্মল দাঁড়িয়ে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, নক্সা মারা কথা শোন। দাদার অসুবিধে হচ্ছে। একটু থেমে বলল, দাদা তো তবু উঁচু টুলে দাঁড়িয়ে। মশারা গ্রাউন্ড লেভেলে ওড়ে বেশি। দেখিস না, একতলার চেয়ে দোতলায মশা কম।

নির্মলের উদাহরণটা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছার ছল করে হাসি আড়াল করলাম। নির্মল আবার আমার কানের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল আমি ভূত দেখছি না তো! তাড়াতাড়ি বললাম, দাঁড়া। চুপ কর।

দৃষ্টিটাকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে সামনের দিকে তাকালাম। না, কোন ভুল নেই। লোকের ভিড়ের মাঝে, এর ওর মাথার আড়াল দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার বাবার মুখ। বাবার মুখখানা কেমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বড় বড় করে আঁতিপাঁতি করে কী যেন খুঁজছে। এমন কিছু গরম পড়েনি। তাসত্ত্বেও বাবার মুখ ভর্তি ঘাম। ঠিক যেন জলের ঝাপটা দিয়েছে চোখেমুখে। মাথার চুলও এলোমেলো।

নিজের জায়গা ছেড়ে আমি ভিড় কাটিয়ে বাইরে এসে ডাকলাম, বাবা? তুমি?

বাবা একরকম দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে টান দিলেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। ভীষণ বিপদ হয়েছে।

আমি হতভম্বিত গলায় বললাম, কী হয়েছে? মায়ের শরীর খারাপ?

বাবা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন, জানি না। চল। জোরে পা চালা।

বাবার গলার স্বরে কান্নার সুর, গেলেই দেখতে পাবি।

আমার নিজের সারা শরীর কাঁপছে। তা সত্ত্বেও আমি বাবাকে পিছনে ফেলে রীতিমত দৌড়তে শুরু করলাম।

আমাদের বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। লোকের ভিড় নেই। উঠোনে পা দিতেই মায়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পঙ্গু বোনটি যে ঘরে দিনরাত শুয়ে থাকে, সে ঘরটিতে আলো জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে বসে মা কাঁদছে।

উঠোন থেকে এক লাফে রোয়াকে উঠে, ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানো মাত্রই আমার ঘাড় থেকে পিঠ বরাবর ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। এ কী দেখছি আমি?

কুসুমের বিছানাটা এলোমেলো। পরনের ম্যাক্সি, বিছানার চাদর জুড়ে রক্তের লাল ছোপ। ঘরের মেঝেতে রক্তভেজা পায়ের লাল ছাপ।

আমার শক্তিহীন বোনটি ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রয়েছে। তার দুগালে এবং গলায় নখের দাগ। ঠোঁট দুটি অল্প ফাঁক।

মাথা তুলে তাকিয়ে আমাকে দেখেই মা ডুকরে কেঁদে উঠল, লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে কে এমন সর্বনাশ করে গেল রে?

আমার মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অসহায় বোনটির দিকে তাকাতে পারছি না। এমন বীভৎস ঘটনার কথা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। ছবিতে দেখলে ভয়ে ঘেন্নায় চোখ বন্ধ হয়ে যায় আপনি। এই অমার্জনীয় অপরাধ করল কে? কোন কাপুরুষ?

মুহূর্তে মনে হল; তবে কি বাবার কথাই সত্যি? যাদের নিরাপত্তার জন্য সংহতি কমিটি গড়ে, মিটিং মিছিল করছি, তাদেরই কেউ বা কয়েকজন মিলে, আমার অসহায় শক্তিহীন বোনটির সর্বনাশ করে, ধর্মযুদ্ধের চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল?

আমার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে। বোনের গলা জড়িয়ে ধরে বালিশে মুখ গুঁজে

মা কাঁদছে। মায়ের কান্নার কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে।

রাগ ঘেন্না তার সঙ্গে কেমন লজ্জা করতে লাগল। এখন কী করা উচিত? কার কাছে যাওয়া যেতে পারে?

বাবা আমার পিঠে আস্তো করে হাত রাখলেন, কী করা যায়, বল তো?

আমি হতচকিত গলায় বললাম, তাই তো ভাবছি।

— ঘরে চল। বাবা বললেন, দুজনে মিলে বসে একটা কিছু ঠিক করি।

— উঁহু। আমি ঘাড় নাড়লাম, পার্টি অফিসে যাব। অনিমেষদাকে সব খুলে বলব।

বাবা কোন জবাব দিলেন না। অপারগের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন।

বাবা আর আমি দুজনে নির্বাক মুখোমুখি বসে। আমার মতো বাবার বুকের মধ্যেও নিশ্চয়ই ঝড় বইছে। রাগ ঘেন্না, তার সঙ্গে লজ্জা এবং ভয়, বাবাকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলেছে।

হঠাৎ মনে হল একদল মানুষ রীতিমত হৈ চৈ করতে করতে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। বাবা মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়চকিত গলায় বললেন, সদর দরজাটা বন্ধ করে দে পল্লব। দল বেঁধে কারা যেন আসছে। আমি লাফ মেরে রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে সদর দরজার দিকে ছুটে গেলাম। তার আগেই একদল লোক খোলা দবজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে এল।

সুধীর দেবু হারু অরুণ পরিমল মৈত্রেয়ী সীমা, তার সঙ্গে সৈফুদ্দিন কামাল নাসের তোয়াব আলি নাজমা, রিক্সাওলা জামালুদ্দিন আর চপল, কাঠ মিস্ত্রি নগেন ঢালি, ছুটিপুর স্কুলের মাস্টারমশাই অলোকবাবু, পান বিড়ির গুমটি মালিক শ্রীধর. এরা সব আমার চেনা মুখ। অচেনা মুখও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে।

পরিমল আমার হাত জাপটে ধরল, কী হয়েছে পল্লব? মিটিং ছেড়ে মেশোমশাইয়ের সঙ্গে তুই অমন দৌড়ে চলে এলি?

আমি পরিমলের মুখের পানে নির্বাক তাকালাম। মনে হল কিছু বলতে গেলেই কান্নায় জড়িয়ে পাকিয়ে যাবে, আমার সব কথা। আমার চোখের লোনা জল গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে নামছে। সৈফুদ্দিন আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল, কাঁদছিস কেন? বল, কী হয়েছে?

আমরা কেউ-ই খেয়াল করিনি মা কখন ঘর ছেড়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকেই মা বেশ জোরে ডাকল, পল্লব?

আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই মা স্পষ্ট উচ্চারণে থেমে থেমে বললল, মেয়েদের একবার আমাব কাছে পাঠিয়ে দে।

মায়ের কথায় কোন জড়তা নেই। গলার আওয়াজেও অদ্ভুত দৃঢ়তা।

অল্পক্ষমের মধ্যেই মানুষের কোলাহলে, দৌড় ঝাঁপের দুমদুম শব্দে, আমাদের পুরনো সেকেলে বাড়িটার ইঁট-চুন-সুরকির দেওয়াল, কড়ি-বরগার ছাদ, সব কাঁপতে লাগল।

কুসুমের ঘরের দরজা আস্তো করে বন্ধ করে, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে মৈত্রেয়ী আর নাজমা। সুধীর চীৎকার করছে, বাড়ির পেছনের বাগানটা দেখ।

জামালুদ্দিন লম্বা একটা বাঁশ হাতে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ছাদের পানে ছুটছে। নগেন ঢালি চেঁচাচ্ছে, বাটালির ঘায়ে মাথা ফুটো করে দোব। অলোকবাবু ব্যস্ত গলায় চপলকে বলছেন, চট করে তোর রিকসাটা নিয়ে আয়। থানায় যেতে হবে।

আমি রোয়াকের এক কোণে চুপ করে বসে আসি। রোদভর্তি ঝলমলে আকাশ ফুঁড়ে, বিকট শব্দে বাজ আছড়ে পড়েছে আমাদের বাড়িতে। মেঘের গুড়গুড়ুনি এখনও থামেনি। আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে।

দেবু এসে আমার সামনে উঁচু হয়ে বসল। আস্তো করে আমার হাত ধরল, দুশ্চিন্তা করিস না। হেমেন ডাক্তারকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। একটু চুপ করে থেকে বলল, কালপ্রিট ধরা পড়বেই। আজ না হয় দুদিন পরে।

আমি মাথা তুলে দেবুর মুখের পানে চাইলাম, অনিমেষদা জানে?

— হুঁ। এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বলে দেবু হাসল, রাজনীতির দাদা কিনা! অবস্থার ওপর নজর রাখছে। একটু থেমে বলল, হাওয়া বোঝার চেষ্টা করছে। ঝড় থেমে গেলে, হয়ত কাল বা পরশু আসবে। তোদের সান্ত্বনা দিতে।

আমার মাথাটা ভারি লাগছে। ঘুম আসার আগের মতো চোখের পাতা ঝুলে পড়ছে। চারপাশে তাকিয়ে সব কেমন ঝাপসা আবছা মনে হচ্ছে। বাবার গলা শুনতে পেলাম, পল্লব?

আমার সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে বাবা। বাবার ক্লান্ত হাত দুটি দুপাশ থেকে দুজনে ধরে রেখেছে। একজন সুধীর। অন্যজন কামাল নাসের।

— পল্লব? বাবা আবার ডাকলেন, এখানে আয়।

আমি ধীর পায়ে বাবার কাছে এগিয়ে গেলাম। বাবা চোখের ইশারায় সুধীর আর কামালকে দেখিয়ে বললেন, এদের নিয়ে ভেতরের ঘরে চল।

আমি হ্যাঁ, না কিছু বলার আগেই বাবা সুধীর আর কামালের হাত ধরে টান দিলেন, পল্লবকে নিয়ে ভেতরের ঘরে এসো সব।

পিছন ফিরে ঘরের দিকে যেতে যেতে আবার বললেন, এসো। আমরা সবাই মিলে বসে, একটা কিছু ঠিক করি।

হঠাৎ একদিন

মল্লিক কাশেম হাটের মুখে পবন মিস্ত্রির একটা কামারশালা আছে। টিনের দেওয়াল। মাথায় টালির ছাউনি। ভেতরটা বেশ বড়। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে ঠাওর করা যায় না। এমনি ঝুপঝুপে অন্ধকার। লোহার জিনিসপত্র ডাঁই করা এখানে সেখানে। অন্ধকারের রং ঠিক তাই কালো নয়। লোহার রং মিলে মিশে দেখায় কালচে তামাটে। কী নেই! নানা মাপের দা বঁটি, কোদাল কুড়ুল, গোরুর গাব-জল খাওয়ার কাঠের ডাবা, যার গায়ে মোটা লোহার পাত মোড়ানো, দোমড়ানো মোচড়ানো সাইকেলের রিম, সরু মোটা লোহার শিক রড — পা বাড়াবার জায়গা নেই কোথাও। এর ফাঁকেই টিনের দেওয়ালে সরু তারের আঁকশিতে ঝোলে পবনের জামা, জামার চেয়েও ময়লা আর ছেঁড়া গেঞ্জি। মেঝেতে অল্প একটু জায়গা জুড়ে উনুন। দড়ি ধরে হাপরে টান দিলে গনগনে হয়ে উনুন জ্বলে ওঠে।

পবনের মেয়ে ধরিত্রী। যার বয়স দশ বছর, পাঁচ ক্লাসে পড়ে। বাপের টিফিন পৌঁছতে বা টুকিটাকি দরকারে কামারশালাতে এলেই হাপরের দড়ি ধরে টান দেয়। ভসভস করে আওয়াজ হয়। ধরিত্রীর লোভ ওই আওয়াজটুকু শোনা। খই ফোটার মতো কয়লার টুকরোগুলো জ্বলে ওঠে। উনুনটাকে দেখায় তখন লাল ফুলে ভরা একটা সাজির মতো। এই দৃশ্যটুকুও ধরিত্রীর বড় প্রিয়।

পবন হিসেবী মানুষ। সাবধানী। সে জানে আগুনের বড় বেপযয় খিদে। কানাকড়ি ছাড় নেই সেখানে। আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে বুড়ো হতে চলল সে। তবু এখনও একটু অন্যমনস্ক হলেই আগুন জিভ চেটে দেয় তার দেহের এখানে সেখানে।

ধরিত্রী হাপরের দড়িতে টান দিলেই সে তাই সাবধান করে, সরে যা। ইদিক পানে আসবি না।

মেয়েটারও অপার কৌতূহল। অবশ্য ছোটদের এমনই হয়, এটা বুঝেও পবন রেগে ওঠে মাঝে মধ্যে, মুখে মুখে চোপা করিস কেন? কেন আসব না? না হলে দেখব কেমন করে? একটু থামে পবন, হাঁ হাঁ করে আগুন জ্বলছে। এতে দেখার কী আছে?

ধরিত্রী চটজলদি জবাব দিতে পারে না। মুখটা একটু কাঁচুমাচু হয়ে যায় তার। ব্যাস, এই অব্দি। পরমুহূর্তেই ফিক করে হেসে ফেলে হাপরের দড়ি ধরে টান দেয়। যেন এটা একটা খেলা। বাপের বকুনি টকুনি এই খেলারই অঙ্গবিশেষ।

এক এক সময়ে এমন হয়, কাজ বন্ধ রেখে পবন যখন খুব অলস ভঙ্গিতে বিড়ি খায় ফুকফুক করে, কাছে পিঠে কোনও মানুষজন নেই, তখন তার ধরিত্রীর কথা মনে পড়ে

যায়। হাপরের দড়ি ধরে মেয়েটা টান দিচ্ছে, গোড়ালি উঁচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গনগনে উনুনটাকে দেখছে, কাঁচের গুলির মতো তার চোখদুটোর পাতা পড়ছে না, তামাটে চুল উড়ছে ফুরফুর করে, আস্ত ছবিটা নিখুঁত দেখতে পায় পবন। তখন তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে ভাবে আর কোনদিন বকাঝকা করবে না মেয়েটাকে। ভাল কথায় বুঝিয়ে বলবে যা বলার। আরে বাপু! পবন নিজেকে বোঝায়, হুরুম দুরুম না করে রইয়ে সইয়ে বোঝাতে পারলে, বুঝবে না কেন? শিশু মানে তো মাটির তাল, নাকি? কি হে পবন? তাই তো?

ওই দেখ, আর একটু হলে পবন নিজেই গুঁজরে পড়ছিল উনুনটার ওপর। বলা নেই কওয়া নেই, ঘুমটি যে কখন এসে ভর করেছে চোখের পাতায়! ভাগ্যিস মেয়েটা ডাকল,

ও বাবা? বাবা? ঘুম নেগেছে?

পবন বিস্মিত চোখে মেয়েকে দেখে। ছোট্ট শরীরখানা যেন দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখের একপাশে আলো পড়েছে। আর সেটা চাঁদের আলো বলেই, থ্যাবড়া থুবড়ো মুখখানায় স্বর্গীয় আভা লেগেছে।

পবন নরম করে ডাকে, আয় না। ভেতরপানে আয়।

ধরিত্রী প্রতিদিনের মতো টিফিন কৌটোটা রাখে। তাতে শব্দ হয় ঠক করে।

পবন নতুন একটা বিড়ি ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে আস্তে আস্তে. আজ একটু দেরী হয়েছে যেন? পড়তে বসবি কখন?

পড়ার কথায় ধরিত্রী কোন সাড়াশব্দ দেয় না। অন্যদিন হলে পবন বকাঝকা করত। আজ সে মেয়ের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আচমকা পড়ে টড়ে গেলে বাচ্ছাদের যেভাবে সান্ত্বনা দেয় ঠিক সেইভাবে,

আচ্ছা, আজকের দিনটা ছেড়ে দে। আজ বরং তোতে আমাতে খেলা করি। কী খেলা বল তো?

খেলার কথা শুনে ধরিত্রীর খুব আনন্দ হল। বাপ মেয়ে দুজনেই এদিকে ওদিক তাকাতে লাগল। খেলার উপকরণ, উপায় এইসব খুঁজে দেখতে লাগল। চারপাশে তো জং ধরা লোহার ভারি ভারি জিনিস সব। তা নিয়ে তো আর একজন শিশু খেলতে পারে না। ধরিত্রীর খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

আর তখনই পবন দুচোখ বড় বড় করে বলল, কী হাঁদা মেয়ে রে তুই? দড়িটা নাকের সামনে ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছিস না?

পবন বলা মাত্রই ধরিত্রী দড়িটা খামচে ধরল।

— টান দে। পবন বলল, আমি উনুনটাকে নেড়ে ঘেঁটে দিই।

ধরিত্রী হাপরের দড়ি ধরে দুএকবার আস্তো টান দিয়ে থেমে গেল!

তখন কামারশালার উল্টোদিকের একটি দোতলা বাড়ির একতলার প্রায় অন্ধকার ঘুপচি ঘরে একটি কিশোরী গান শুরু করেছে —

জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।

ছোট ছোট জানলার ফাঁকফোঁকর দিয়ে সুর ভেসে বেরিয়ে আসছে। পবনের কামারশালাতেও সেই সুর ঢুকে পড়ল।

পবন নিশ্চুপ মেয়ের দিকে চেয়ে, কী হল? বলবার আগেই ধরিত্রী বলল, বাবা, ও বাবা! এই গানটা আমিও জানি।

পবন বিস্মিত চোখে মেয়ের মুখের পানে তাকাল, জানিস? গা না।

ধরিত্রী কিন্তু গানের ওই একটি কলিই জানে —

জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কলি গানই সে গাইতে লাগল। গানের মাঝে কখন যে সে হাপরের দড়িতে টান দিতে শুরু করেছে, নিজেরই খেয়াল নেই।

হাপর শ্বাস ফেলছে ভসভস করে। পবনও অভ্যস্ত হাতে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে কয়লার টুকরোগুলিকে।

কামারশালায় এখন কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। একসময় পবন বলল, একই লাইন গাইছিস কেন?

— আমি আর জানি না। ধরিত্রী জবাব দিল।

— শিখে নিলেই তো পারিস। কোন সিনেমার গান?

ধরিত্রী ঠোঁট ওলটাল, কি জানি!

বাপ মেয়ে দুজনেই চুপ করে রইল। পবন উনুনের সামনে থেকে উঠে এসে টিফিন কৌটোটা খুলল। টিফিন খেল একমনে।

সামনের বাড়ির কিশোরীটি তখনও গান গাইছে। পবন মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওই তো গাইছে। মন দিয়ে শোন না।

ধরিত্রী মোটেই শ্রুতিধর নয়। সে তাই অন্যমনস্কের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

টিফিন শেষ করে পবন মেয়ের হাত ধরে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশ জ্যোৎস্নায় টইটুম্বুর। কিন্তু জ্যোৎস্নারাতের গানটা থেমে গেছে। অন্য একটা গান শুরু হয়েছে। এ গানটাও কোন সিনেমার, পবন জানে না।

সে তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করল,

তোদের ইসকুলে কোন গানটান শেখায় না?

— হ্যাঁ।

— কী গান?

— রবীন্দ্রসংগীত। গাইব? বলে ধরিত্রী তার ছোট হাত দুটি ঢেউয়ের ভঙ্গিমায় দুলিয়ে দুলিয়ে —

আলো আমার আলো ওগো

আলোয় ভুবন ভরা। গাইতে শুরু করল।

পবন অনেকক্ষণ শুনে সমঝদারের মতো মাথা দোলাল,

— খারাপ নয়, কী গান বললি?

— রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান।

— রো-বি-ন-ন-দো-না-আ-থ ঠা-কু-র?

— না, না। ধরিত্রী খিলখিল করে হেসে উঠল বাবার তোতলামো দেখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্যাস।

— রো-বি-ই-ঠা-কু-র?

— উঁহু।

— ওই হল। ওই হল। বলে পবন হাসতে লাগল।

কামারশালার ভেতরটা ঝুপঝুপে অন্ধকার। চারপাশে ডাঁই করা লোহার জিনিসপত্র। বাল্বের আলোয় তারা সব ভূতুরে চেহারা ধরেছে। পা বাড়াবার জায়গা নেই কোথাও। আর তেমনি গরম। এর মধ্যে বসেই প্রতিদিনের মতো কাজ করল পবন।

কিন্তু রাতের বেলায় বাড়ি ফেরার সময় যখন সে টিনের দরজাটা বন্ধ করতে গেল, খুব অবাক হয়ে দেখল, চাঁদের আলোয় কামারশালার ভেতরটা থইথই করছে। এত আলোর মধ্যে সে বসেছিল! খেয়ালই করেনি! আশ্চর্য্য! টিনের ফাঁকফোকর দিয়ে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে ঢুকে পড়ে। এটা সে জানে। তা বলে মেঝে দেওয়াল টেওয়াল সব এমনভাবে ভাসিয়ে দিয়ে!

ব্যাপারটা পবনকে খুব অবাক করল। অলৌকিক মনে হল। অজান্তেই কেঁপে উঠল তার শরীর। কিন্তু তারপরেও চাঁদের আলোটুকু যাতে তার দোকান ঘর ছেড়ে পালিয়ে না যেতে পারে, এমনি ভেবে, সে দরজার তালাটা নিশ্চিত বন্ধ হয়েছে জেনেও, শব্দ করে নেড়েচেড়ে সেটা দেখে নিল বেশ কয়েকবার।

আদালত চলছে

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মাত্রই জজসাহেব বললেন, লেখাটা পড়ুন।

'লেখাটা' মানে শপথ বাক্য। সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে, বড় বড় হরফে এবং বেশ ফাঁক ফাঁক করে লেখা।

আজ নিয়ে আমি ত্রিশ চল্লিশ বা তারও বেশীবার শপথ বাক্য পড়লাম। লেখার বয়ানটি আমি চোখ বুজে আওড়ে যেতে পারি। কমা, কোলন, দাঁড়ি ঠিক ঠিক বলে যেতে পারি চোখ বন্ধ অবস্থাতেই। জজ সাহেবরা অনেকেই আমাকে চেনেন। অধিকাংশ উকিলবাবুর সঙ্গেও আমার ভালরকম পরিচয় আছে। প্রায়ই আমি তাঁদের চা খাওয়াই। নববর্ষে ডাইরি দিই।

শপথ বাক্যটি পড়া শেষ করা মাত্রই জজ সাহেব বললেন, ঠিক ঠিক পড়েছেন তো? কোন লাইন টাইন বাদ যায়নি? মনে রাখবেন, এটা আদালত।

সকলে না হলেও কোন কোন জজ সাহেব এ ধরণের প্রশ্ন করেন। এঁরা কি কানে খাটো? নাকি বিচার শুরুর আগে এ ধরণের প্রশ্ন করাটা পেশাগত এথিকসের মধ্যে পড়ে! সকলে হয়ত মানেন না। কেউ কেউ মানেন। আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

— ইওর অনার! সরকারী উকিল জজ সাহেবের দিকে তাকানো মাত্রই তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রসিড।

এখানে, এই স্পেশাল কোর্টে সরকারী উকিল, কোর্টের পরিভাষায় এপিপি, একজন মহিলা। বয়স ৩৫ থেকে ৪০-র মধ্যে। চেহারায় লাবণ্য আছে। ঠোঁটের ওপর বরাবর সমান্তরালভাবে ডানগালের শেষপ্রান্তে ছোট কালো একটি তিল, মুখের সামান্য অসঙ্গতিগুলি ঢেকে দিয়ে একটি সুন্দর সুষমা এনেছে। এজলাসে ঢোকার আগে উনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন অনেকেই চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে ওনাকে দেখছিলেন।

যেহেতু আমি সরকারপক্ষের সাক্ষী এবং আমার সুপারভিশনে আসামীকে ধরার কাজটি করেছিলেন আমার অধস্তন সহকর্মীরা, সুতরাং এক্ষেত্রে চার্জশিটে আমার সই না থাকলেও, আমার সাক্ষ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কেসের আই. ও. এবং ডি. ও. হরিপুর থানার বড়বাবু। গত পরশু তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি তাঁর সাক্ষ্য শুনতে পাইনি। স্পেশাল কোর্টে সরকারপক্ষের কোন সাক্ষীর শুনানির সময়, ঐ একই কেসের

অন্য কোন সরকারী সাক্ষী সেটি শুনছে, বা শোনার চেষ্টা করছে, এমনটি চোখে পড়লেই আসামীর উকিল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, ইওর অনার, নেক্সট উইটনেস ওভারহিয়ার করছে। নোট ইট।

জজ সাহেব কড়া ধমক দেন। এতে কেসের মেরিট নষ্ট হয়।

বেশ কিছুদিন হল লক্ষ্য করছি একটি রাজনৈতিক দলের অনুগামী আনকোরা অজ্ঞ কিছু উকিল সরকারী প্যানেলভুক্ত হয়ে এপিপি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। যে কারণে সরকারী উকিলের যে ধরনের বুদ্ধিমত্তা এবং বাগ্মিতা থাকা প্রয়োজন, তার ছিটেফোঁটাও এঁদের মধ্যে নেই। সরকারী সাক্ষীকে যে ধরণের প্রশ্ন করে বিপক্ষের উকিলের জেরা করার সুযোগটা কমিয়ে দেওয়া যায়, এইসব এপিপিরা মোটেই সে ধরণের আটঘাট বাঁধা, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করতে পারেন না। পরোক্ষে এমন সব প্রশ্ন করেন, যাতে সরকারী সাক্ষী বিব্রত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

যেমন লাবণ্যময়ী এপিপি আমাকে দুম করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, সত্যি সত্যি আপনি রেড সুপারভাইজ করেছেন? নাকি চার্জশিটে আপনার ওসি আপনার নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, কেসটা জোরদার করার জন্য? সিজার লিস্টে আপনার সই নেই। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা কেসে আপনি হাজির থেকেও কাগজে কলমে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন কেন? এতে আপনাদের সার্ভিস রেকর্ডে আঁচড় পড়ে না?

আমার ইচ্ছে হল বলি, ইওর অনার, আমার লার্নেড এপিপি-র অবস্থানটা বুঝতে পারছি না। উনি কি আসামীর কাছ থেকে কোনরকম উৎকোচ নিয়েছেন? তা না হলে এ ধরণের অবান্তর প্রশ্ন করে মহামান্য আদালতের অমূল্য সময় নষ্ট করছেন কেন?

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে উকিলসাহেবার হয়ত মনে হল, সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য একজন আইনজীবি হিসাবে তিনি যা করছেন, তা তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে গেলেও, অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কোনরকম আপস করতে রাজি নন। তাই আবার বললেন, কী হল? চুপ করে আছেন যে! বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্টের যে ধারায় আপনার ওসি আসামীকে ধরেছেন, আপনার কি মনে হয় ধারাটি এক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয়েছে?

কোর্টঘর জুড়ে প্রথমে চাপা গলায় তারপর একটু আধটু আওয়াজ করেই কয়েকজন হেসে উঠল। জজসাহেব টেবিল চাপড়ে ধমকের সুরে বললেন, চুপ, চুপ। এটা পাবলিক থিয়েটার হল নয়। আদালত চলছে।

হাসির কারণটা আমি ধরতে পেরেছি। এটা স্পেশাল কোর্ট। আমি যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি সে গাঁজার আসামী। তার বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে এন.ডি.পি.এস অ্যাক্ট অনুসারে। সম্মানীয় উকিলসাহেবার এন.ডি.পি.এস অ্যাক্ট সম্পর্কে সম্যক কোন ধাবণাই নেই! গান গাইতে উঠে কোন শিল্পী যদি রবীন্দ্রসংগীত ঘোষণা করে নজরুল বা অতুলপ্রসাদের গান শুরু করেন, বোদ্ধা শ্রোতারা হেসে উঠবেই। আমি লক্ষ্য করলাম বিস্মিত জজসাহেবের

দু চোখ কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসছে। যেমন লজ্জায় দু চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন জর্জ কোর্টের মোক্তার।

অজ্ঞাতে বা অসাবধানতায় বেফাঁস কিছু বলে ফেলার জন্য যে অবস্থাটা সম্মানহানির পর্যায়ে চলে গেছে এটা বুঝতে পেরেই উকিলসাহেবা জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কারণ হাসলে তাঁকে আরও একটু বেশী সুন্দর দেখায়।

ইওর অনার, আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

— বসুন। ধীর গলায় বললেন জজসাহেব। তাঁর উচ্চারণে পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে ক্ষমার ছোঁয়াও রয়েছে। আমার মতো হয়ত দু চারজন সেটা বুঝতেও পেরেছেন। জজের স্টেনোগ্রাফার, টাকমাথা মধ্যবয়সী একজন শ্রোতা এবং স্থানীয় পুলিশ থানার ওসি, তিনজনেই জজসাহেবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বন্ধ দুঠোঁট ডানে বাঁয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে হাসি সামলাবার চেষ্টা করছেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। আমার বিপক্ষের অর্থাৎ আসামী পক্ষের উকিল কাগজ হাতে উঠে দাঁড়ানো মাত্রই জজসাহেব বলে উঠলেন, চুপ চুপ। আদালত চলছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার পাগড়ি মাথায় গোঁফওলা লোকটির ভঙ্গিতে বিপক্ষের উকিল শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লেন,

ইওর অনার, মে আই বি পারমিটেড ...!

— প্রসিড। জজসাহেব সামনের টেবিল থেকে একটি কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর ঘসঘস করে কী সব লিখতে লিখতেই বললেন, মনে রাখবেন সাক্ষীকে শুধুমাত্র আজই ক্রশ করার সুযোগ পাবেন। আওয়ার ইনটেনশন শুড বী কুইক ডিসপোজাল অফ দি কেস।

আসামী পক্ষের উকিল কাঁচাপাকা গোঁফ নাচিয়ে, তাঁর ডান হাতে ধরা কাগজের দিকে চেয়ে, বাঁহাতে গলার ছোট সাদা টাইটিতে অল্প একটু টান দিলেন। পেনাল্টি কিক মারার আগে অনেক খেলোয়াড় যেমন বলটিকে এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে মনসংযোগের চেষ্টা করেন, এক্ষেত্রে টাই-এ অল্প টান দিয়ে উকিলবাবু সেইরকমই কিছু একটা করলেন, আপনার নাম? বাবার নাম? সার্ভিস ডেজিগনেশন?

আমার জবাব স্টেনোগ্রাফার ঝড়ের গতিতে লিখে ফেললেন।

— সীজার, অ্যারেস্ট, সব কিছু আপনার সুপারভিশনে হয়েছে?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ।

— কীভাবে সব কিছু করলেন?

— সরকারী নিয়ম অনুযায়ী যা যা করণীয় কর্তব্য, সেসব মেনেই করা হয়েছে।

— ডোন্ট টক সিলি। জজসাহেব আমার দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন, নিয়মগুলো কী কী ভেঙ্গে বলুন। 'করণীয় কর্তব্য মেনে' — এভাবে বললে কেসের রেজাল্ট জিরো

মানে শূন্য হবে।

— সরি স্যার। আমি লজ্জিত গলায় বললাম।

— আপনি কি আসামীর নাম ধরে তাকে ডেকেছিলেন?

— হ্যাঁ।

— আপনার ডাক শুনে আসামী বেরিয়ে এল?

— আমি ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ।

— কোথায়? উঠোনে? নাকি বাড়ির বাইরে?

— উঠোনে।

— আপনাদের দেখে আসামীর বাড়ির লোকের কোনরকম সন্দেহ হয়নি? আসামী লুকিয়ে পড়ার বা পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করে, আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল?

— হ্যাঁ। আমি বললাম, আসলে ও আমাকে একজন খরিদ্দার ভেবেছিল। তাই তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

— আপনার সঙ্গের লোকজন! তারা তখন কোথায় ছিল?

— তারা বাড়ির বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কেবল একজন কনস্টেবল আমার সঙ্গে ছিল।

— ইওর অনার! বিপক্ষের উকিল জজসাহেবের উদ্দেশে বললেন, গ্রামের মধ্যে দিনের আলোয় গাড়ি ভর্তি লোকজন নিয়ে ইনি নিজের ছক অনুযায়ী সামান্য দূরে গাড়ি রাখলেন। লোকজন নিয়ে আসামীর বাড়ি ঘিরলেন। আসামীর বাড়ির সদর দরজা খোলা দেখে, কোনরকম সৌজন্যের পরোয়া না করে সরাসরি বাড়ির উঠোনে গিয়ে হাজির হলেন। আশপাশের লোকজন কেউ কিছু জানতে পারল না। তারা ভিড় করল না। গ্রামের কোন যুবক বা বয়স্ক কোন মানুষ কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। এমনকি মাননীয় ডি.ই.সি. সাহেবের! বলে আমার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, এমন ঝকঝকে চেহারার একজন মানুষ অজ গ্রামের গাঁজার কারবারির খদ্দের হতে পারে কিনা, এ প্রশ্নটাও আসামীর মনে এল না!

— স্যার! আমি জজসাহেবের মুখের দিকে তাকালাম, শহরের মানুষ গ্রামে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে একটু আধটু নেশা করে। আসামী আমাকেও ওইরকম একজন শহুরে খদ্দের বলে মনে করেছিল।

— দূর! জজসাহেব চোখমুখ কুঁচকে এমনভাবে বললেন যেন আমার জবাবটা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, খানিকটা ফালতু গোছের, আপনি এমন বলছেন যেন শহরে নেশা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে বা নেশাখোরদের শহুরে মানুষ সামাজিকভাবে বয়কট করেছে। আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

জজসাহেব চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলে রাখলেন। কয়েক মুহূর্ত দুচোখ বন্ধ করে

কী যেন ভাবলেন। তারপর বন্ধ চোখ খুলে টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিলেন, না থাক। ঘটনাটা বেশ লম্বা। তবে এটা বলতে পারি সিগারেটের মধ্যে গাঁজা ভরে খাওয়াটা, শহুরে মানুষের কাছে এক টিপ নস্যি নেওয়ার মতো মাইনর নেশা। জন্মদিন, বিয়েথাওয়া, বিবাহবার্ষিকী, আবার শোকে দুঃখে কাতর হয়ে, প্রিয়জনকে দাহ করতে গিয়ে, এমনকি মা-বাবার শ্রাদ্ধেও মদ খাওয়াটা ফ্যাসন হয়ে গেছে। কেউ কিচ্ছু মনে করে না। সুতরাং নেশা করার জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে হবে ...! জজসাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরের মধ্যে কয়েকজন খুক খুক করে হেসে উঠল। ফিসফাস গলায় কথাবার্তা শুরু হল ঘর জুড়ে। বিপক্ষের উকিল ঠোঁট বন্ধ করে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। ভাবখানা যেন এবার উনি আমায় মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন। আমি আস্তো ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, এপিপি সাহেবাও হাসছেন। হাসির দৌলতে আমি তাঁর দুধসাদা সুসংবদ্ধ দাঁতের সারি দেখতে পেলাম। মনে মনে বললাম, সকালটা ইয়ের হলে দিনটা তোমার। এল. আর-এর স্টিকচার খেলে হাসি বেরিয়ে যাবে।

— মী লর্ড! বিপক্ষের উকিল গলার সাদা টাই ধরে অল্প টান দিলেন, এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কেসটি আদ্যন্ত সাজানো। একজন গরীব নিরীহ মানুষকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে, মাননীয় ডি.ই.সি. সাহেব তাঁর দপ্তরে একজন নামী অফিসার হিসাবে নিজেকে এসট্যাবলিশ করতে চেয়েছেন। কারণ আফটার অল কেসটি গাঁজার কেস। এ কেসের সাজা বেশ কঠিন। কারাবাস। মানিটারি পেনাল্টি হলে, তার পরিমানও কম নয়। কয়েক লক্ষ টাকা।

— অবজেকশন ইওর অনার। বিস্ময়ে আমার দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। সুতনুকা এপিপি সাহেবা সটান উঠে দাঁড়িয়েছেন, আসামী দোষী সাব্যস্ত হলে তার সাজা ঘোষণা করবেন আপনি। অন্য কেউ এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেন না।

আদালত কক্ষের মধ্যে চাপা স্বরে আবার একটু গুঞ্জন শুরু হল। জজসাহেব বেশ শব্দ করে টেবিল চাপড়ালেন, চুপ চুপ। এটা ভোট মিটিংয়ের স্ট্রীট কর্ণার নয়। আপনারা — বলে এপিপি এবং বিপক্ষের উকিল দুজনের দিকে চেয়ে কড়া গলায় বললেন, অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করবেন না। এটা আদালত।

— সরি স্যার। বিপক্ষের উকিল অপরাধীর ভঙ্গিমায় একটুখানি মাথা নোয়ালেন, এটি আমার শেষ প্রশ্ন, সাক্ষীকে অনুরোধ করব এই ঘরের মধ্যে আসামীকে আইডেনটিফাই করার জন্য।

এবার আমার হাসি পেল। আসামী যে আদালত কক্ষের ভেতরে লোহার খাঁচার মধ্যে থাকবে, আমার মতো একজন পোড়খাওয়া অফিসারের সেটা না জানার কথা নয়। বিপক্ষের উকিল 'আইডেনটিফাই' শব্দটার ওপর এমন জোর দিলেন যেন খড়ের গাদায় আলপিন খোঁজার মতো দুরূহ একটা কাজের ভারে উনি আমাকে নাজেহাল করে ছাড়বেন।

আদালত কক্ষের ডান দিকের কোণে লোহার খাঁচার দিকে তাকালাম। মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। স্বল্প আলোতে লোহার খাঁচার মধ্যে আমি যে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে খাঁচার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে, বিপক্ষের উকিল বললেন, কী হল? আসামীকে দেখতে পাচ্ছেন? চিনতে পারছেন?

— ইওর অনার, আমার সহায়িকা এপিপি উঠে দাঁড়ালেন, আসামী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুম ভাঙ্গিয়ে ওকে উঠে দাঁড়াতে বলুন।

চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারী লোহার খাঁচার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ চীৎকার করে বলল, স্যার, আসামী ঘুমিয়ে পড়েনি। জেগেই আছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

আদালত কক্ষের মধ্যে মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। চেয়ার এবং বেঞ্চে বসেছিল যারা, তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। একজন দর্শক জজসাহেবের দিকে চেয়ে বলল, ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করুন, স্যার। এজলাসের পাহারাদার পুলিশ কনস্টেবল দুমদুম শব্দ করে লোহার খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল। আসামী পক্ষের একজন মাঝবয়সী দুর্বল চেহারার মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠল। সস্তার ছাপা শাড়ি পরনে একটি যুবতী এজলাসের কাছে ছুটে এল, স্যার আপনি কিছু করুন। বাবার প্লুরিসি আছে। তিন মাস জেলের মধ্যে ওষুধ পায়নি। পেটপুরে খেতেও পায়নি।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, পুলিশ কনস্টেবল আর তাদের সঙ্গে কয়েকজন দর্শক লোহার খাঁচাটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে চেঁচাচ্ছে, কী হল? উঠছো না কেন? তোমার শরীর খারাপ লাগছে? কষ্ট করে একবার উঠে দাঁড়াও। জজসাহেব তোমাকে দেখতে চাইছেন। এপিপি, আসামীর উকিল পরস্পরের মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছেন। জজ সাহেবের চোখমুখে উৎকণ্ঠার ছায়া পড়েছে। ঘরের ভেতরের হৈচৈ বাইরে থেকে শুনতে পেয়ে বেশ কিছু লোক ঘরের দরজায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

রায় শুনে অনেক আসামী মূর্ছা যায়। অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্ট্রোক হয়েছে এমনও শোনা গেছে। কিন্তু বিচার চলাকালীন কোন আসামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এমনটা শুনিনি আমি। আমার মনে হল জজসাহেব এবং দুপক্ষের উকিলদের কাছেও আজকের অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ অচেনা। একেবারে নতুন। জজ সাহেবের উৎকণ্ঠামাখা থমথমে মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আসামীর শারীরিক অবস্থা যদি তেমন খারাপ কিছু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে, এই ভাবনায় বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে।

সবাই যখন খারাপ কিছু ঘটে গেছে এমন ভাবনায় আকুল অস্থির হয়ে পড়েছে, লোহার খাঁচার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছেন জজ সাহেব এবং সেইমত খাঁচার তালা খোলার জন্য চাবির গোছ হাতে কোর্ট কাস্টডির কর্মচারী হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে, উত্তেজনায় একের পর এক ভুল চাবি লাগিয়ে তালা ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে, হয়ত সেই ধাতব শব্দের ঝনঝনানিতে, আসামী মেঝের ওপর শোয়া অবস্থাতেই আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ঘরঘরে গলায় বলল, কী হয়েছে?

— তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

— কই! না তো!

— তাহলে সাড়া দিচ্ছ না কেন?

— ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন জেগে আছি।

— ঘুমিয়ে পড়েছিলে? গলার স্বর বিকৃত করে পুলিশ কনস্টেবল ধমকে উঠল, মারব পোঁদে তিন লাথি। স্যার ডাকছেন, উঠে দাঁড়াও।

— উঠছি তো। চেঁচাচ্ছ কেন?

— এটা ঘুমোনোর জায়গা? পুলিশ কনস্টেবল গলার স্বর আরও চড়িয়ে বলল, থানা লক আপে গিয়ে প্রাণভরে ঘুমিও।

— কী করব? বলে আসামী পরনের নোংরা ছোট ধুতিটি সামলে সুমলে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল, হুজুর। আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। কিন্তু কতক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় বলুন?

— ঠিক আছে। আসামীর উকিল হাতের ইশারায় জজ সাহেবকে দেখালেন, তুমি চুপ করো।

— আমি তো চুপ করেই অছি। যা বলার আপনারাই বলছেন। হুজুর আমাকে যদি দু চারটে ন্যায্য কথা বলার সুযোগ দেন।

— অবজেকশন ইওর অনার। সরকারী উকিলসাহেবা উঠে দাঁড়ালেন, কোর্ট কাস্টডির মধ্যে দাঁড়িয়ে এভাবে ...!

— আই ডু অ্যাডমিট ইউ। আসামীর উকিল ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলেন সরকারী উকিল সাহেবাকে।

— ঠিক, ঠিক। জজ সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, তুমি এভাবে বলতে পার না। তোমার কথা উকিলবাবু বলবেন। বুঝেছ! এটা আদালত।

আসামী আর কোন সাড়াশব্দ করল না। লোহার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জজ সাহেব সাদা কাগজে দ্রুত কয়েকটা লাইন লিখলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, ভেবেছিলাম কেসটা দ্রুত মিটে যাবে। কিন্তু আসামী ঘুমোনোর ছল করে এমন একটা সিন ক্রিয়েট করল, যেটা আদালতের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, বরং বেশ অপমানজনক।

আদালতকক্ষ জুড়ে নীরবতা। জজসাহেবরা থমথমে মুখে কথা বলেন, এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত, গরীব বড়লোক সবাই জানে। কিন্তু আসামীর বেয়াদপ আচরণে জজসাহেব রেগে গেলে, অপমানিত বোধ করলে, অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে এ সম্পর্কে কারোরই কোন ধারণা নেই।

— এটা মেনে নেওয়া যায় না। আইনের বিচারে ধনী দরিদ্র অপরাধী নিরপরাধীর

মধ্যে কোন ফারাক করা হয় না। তার মানে এই নয়, আইনকে নিয়ে যে কেউ রঙ্গতামাশা করবে। জজসাহেব বললেন।

— ঠিক, ঠিক। সরকার এবং আসামী দুপক্ষের উকিল এক সঙ্গে বলে উঠলেন, আইনের উর্দ্ধে কেউ নয়। ওর বিরুদ্ধে কনডেম অফ কোর্ট চার্জ গঠন করা উচিত।

— গরীব মানুষের পক্ষে কেস চালানো কষ্টকর। আমি বুঝি। জজসাহেব যেন কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক এমনিভাবে আদালত কক্ষের মানুষজনকে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু গরীব, শুধুমাত্র এই অজুহাতে সে যা খুশি তাই করতে পারে না। নেকস্ট ডেট ফর হিয়ারিং — বলে তিনি পেশকারের দিকে তাকালেন। পেশকার দ্রুত ডাইরীর পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন।

— ষোল নয়?

— না।

— বাইশ দশ?

— উঁহু।

— সাত এগার?

— না। জজসাহেবের গলায় বিরক্তি, আরও মাসখানেক পিছোন। বুঝতে পারছেন না কেন, আমি লং গ্যাপ চাইছি, সেটা ওরই ভালর জন্য। তড়িঘড়ি ডিসপোজাল হয়ে গেলে, আজকের ঘটনার জন্য ওর মনে কোনরকম অনুশোচনা বা অপরাধ বোধ বা ঐ জাতীয় মানে কী বলব মানে .... জাগবে না।

— বুঝেছি স্যার। পেশকারবাবু এক ঝটকায় ডাইরীর শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন, তেইশ বারো, স্যার। এ বছরে ওটাই শেষ দিন। তারপর কোর্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জজসাহেব সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা দোলানো মাত্র, পেশকারবাবু বেশ জোর গলায় থেমে থেমে বললেন, নোট করে নিন। নেক্সট ডেট ফর হিয়ারিং টোয়েন্টি থার্ড ডিসেম্বর।

আসামী নীলমাধব হাজরাকে আদালত কক্ষের বাইরে আনা হল। তিন মাস জেল খাটার পর এখন সে জামিনে আছে। আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আমি নীলমাধবকে স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি। ভরা আলোর মধ্যে আমি তার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। লোকটি কেবল অসুস্থই নয়, জেনুইন গরীব। পরনের পোশাক দেখে যা সহজেই অনুমান করা যায়। সদ্য হাঁটতে শেখা একজন শিশু যেভাবে হাঁটে, ঠিক সেইভাবে পায়ে পায়ে হাঁটছে নীলমাধব। হয়ত যে কোন সময়েই পড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় নীলমাধবের দুটি হাত দুপাশে ধরে রেখেছে তার স্ত্রী এবং মেয়ে।

মা মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। পাছে আমার দিকে ওদের চোখ পড়ে যায়, সে এক বিড়ম্বনা, এই ভাবনায় আমি মুখ ঘুরিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে রইলাম।

বড়জোর তিন কি চার মিনিট, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি নীলমাধব আমার খুব কাছে চলে এসেছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই মিনতিভরা গলায় বলল, বড়বাবু, একটু শুনবেন?

আমি একটু কঠোর ভাব দেখালাম, কিছু বলবে?

— আজই তো আপনাকে প্রথম দেখলাম। কোর্টের মধ্যে হই হট্টগোলে আপনাকে পেন্নাম জানানো হয়নি। নীলমাধব তার সরু হাত দুটি জড়ো করে কপালে ঠেকাল। কে যেন সপাং করে চাবুক মারল আমার পিঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, জানো, আমি তোমার আরও সর্বনাশ করে দিতে পারি।

— আরও? নীলমাধব যেন আমার সঙ্গে মস্করা করছে। তার ঘোলাটে চোখ দুটিতে হাসি খেলে গেল, সব্বোনাশের আর কি বাকি আছে? তিন মাস হাজতবাস করলাম। বিঘে দুই জমি ছিল, উকিলবাবুর গভ্যে গেল। সোমত্ত মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলাম না। শেষ রেস্তটুকু চলে গেল। তারওপর পুরনো অসুখটা আবার চাগার দিয়েছে।

— চুপ। আমি ধমকের সুরে বললাম, তোমার ফিরিস্তি কে শুনতে চেয়েছে? অপরাধ করেছো। সাজা ভোগ করছো।

— অপরাধ কি বলেছন, বড়বাবু? চাষাভূষো মানুষ একটু মদ গাঁজা খাবে না? খেলে যদি কেস হয়, তাহলে আমার পাশের বাড়ির শক্তি মন্ডল, যে মাসে মণ মণ গাঁজা বেচছে, আবার বুক ফুলিয়ে চলছে, তার ক্ষেত্রটি কী হবে?

— তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ। এর ফল কী হবে জান? রাগে উত্তেজনায় আমার সারা শরীর কাঁপছিল, মনে রেখো এটা কোর্ট। মাঠ ময়দান নয়।

— বাবা, কী হচ্ছে! নীলমাধবের মেয়ে বাবার হাত ধরে টান দিল, চলো। কে কী করছে, তাতে তোমার কি? সে ওনারা বুঝবেন।

নীলমাধবের মেয়ে শ্লেষমাখানো কথাগুলি যে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলল, বুঝতে পারলাম। কথাগুলি আমাকে বিঁধল।

একপাশে স্ত্রী, অন্যপাশে মেয়ে, মধ্যিখানে নীলমাধব অশক্ত পায়ে টলতে টলতে লম্বা কোর্ট বারান্দা পেরিয়ে যাচ্ছে। আজ সপ্তাহের প্রথম দিন। কোর্ট চত্বর জুড়ে অনেক লোকের ভিড়। এর মধ্যে ভালমন্দ, সৎ অসৎ, অপরাধী নিরপরাধী সবাই আছে। আমার সামান্য তফাতে সুন্দরী মোহময়ী এ পি পি এবং নীলমাধবের উকিলবাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা একই কলেজের একই ক্লাসের পড়ুয়া এবং সদ্য প্রেম এসেছে দুজনের মধ্যে। সি.জি.এম. কোর্টের দরজায় দাঁড়িয়ে আসামীর নাম ধরে ডাকছে কোর্ট চাপড়াশি। ব্যস্ত পায়ে চলতে চলতে একজন উকিলবাবু খেয়ালই করেননি, তাঁর হাত থেকে লাল সুতোয় বাঁধা কেস রেকর্ডটি কখন মাটিতে পড়ে গেছে। চাষাভূষো চেহারার হেঁটো ধুতি একজন সেটি উকিলবাবুর হাতে তুলে দেওয়া মাত্রই, উকিলবাবু সন্দিগ্ধ চোখে লোকটির দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন, রাস্কেল, এটা তোর হাতে গেল কিভাবে?

ছেলে কোলে একজন মহিলা মিনমিনে গলায় গান গাইছে, এ মায়া প্রপঞ্চময়। এ মায়া প্রপঞ্চময়। আর হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে।

নীলমাধব হাজরা অনেকটা দূর চলে গেছে। নিচে নামার সিঁড়ির মুখে। এখনও ও আমার দৃষ্টির মধ্যে আছে বলেই, আমি সিঁড়ির দিকে এগোতে পারছি না। আমার হাতে ধরা সরকারী সাক্ষ্যের কাগজপত্র। তার মধ্যে ইনফর্মেশন রেজিস্ট্রার এবং ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্টের ডুপ্লিকেট কপিও আছে।

ইনফর্মেশন রেজিস্ট্রারে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে সংবাদদাতার নাম — শক্তি মন্ডল, গ্রাম -বেহেরামপুর, পুলিশ থানা-খানাকুল। ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্টে পরিষ্কার লেখা আছে — এন.ডি.পি.এস. কেস নং-৫/২০০৩-০৪। অন রিসিপ্ট অফ অ্যান ইনফর্মেশন ফ্রম এ রিলাইয়েবল সোর্স, দি অ্যাকিউসড, নীলমাধব হাজরা অফ ভিলেজ বেহেরামপুর, আন্ডার পি. এস. খানাকুল ওয়াজ অ্যারেস্টেড অ্যান্ড ফরওয়ার্ডেড টু কোর্ট অফ ল।

নীলমাধব হাজরা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। এবার আমি এগোতে পারি। মনে মনে দুবার আওড়ে নিলাম, পরবর্তী দিন তেইশ বারো। ডাইরীতে নোট করে নিতে হবে।

জজ কোর্টে অন্য একটি মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। জজ সাহেব কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ধরাচূড়ো পরে চেয়ারে এসে বসেছেন আবার। আমাকে যেমন, ঠিক একইভাবে অন্য একজন সাক্ষীকে বলছেন, ঠিক ঠিক পড়েছেন তো? কোন লাইন টাইন বাদ যায়নি? মনে রাখবেন এটা আদালত। আদালত চলছে।

ঘা

ভাল আছেন মাস্টারমশাই? মাথা নিচু করে হরমোহন সর্বজ্ঞর পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে অবিনাশ চমকে উঠল।

হরমোহনের রুক্ষ খসখসে দুটি পায়ের পাতাতেই দগদগে ঘা। খয়েরী-লালচে রং। রস ফেটে বেরোচ্ছে।

অবিনাশের গায়ের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। সে খুব সাবধানে, পায়ে হাত না ঠেকিয়ে মুহূর্তেই মাথা তুলে নিজের হাত দুটি জড়ো করে কপালে ঠেকাল। ভাবখানা, দুবার প্রণাম। একবার পায়ে হাত দিয়ে। সেটাও যথেষ্ট মনে না হওয়াতে, কপালে দু হাত জড়ো করে আর একবার।

হরমোহনকে এ তল্লাটে সকলেই চেনে। বছর দশ বাবো হল, বাসা বদল করে কলোনীতে এসে আছেন। পেশায় পুরোহিত। দু চারঘর বাঁধা যজমান আছে। কলোনীর শেষ প্রান্তে নিচু জোলো জমিতে হরমোহনের বাসা। ইঁটের দেওয়াল। মাথায় টালি দেওয়া মোটামুটি বড়সড় একটি ঘর। কোলে এক টুকরো রান্নাঘর। দরমা ঘেরা। একটানা কয়েকদিন বৃষ্টি হলে, সংসারের টুকিটাকি সব জিনিস চৌকির ওপর তুলতে হয়। শকাপিট উপচে দুর্গন্ধ নোংরা জল উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। তখন হরমোহনের 'অবৈতনিক বিদ্যালয়'-এ অঘোষিত ছুটি।

হরমোন সর্বজ্ঞ ঠিক কতদূর লেখাপড়া করেছেন, সঠিকভাবে তা কেউ জানে না। সব বিষয়ে না হোক, ঠিক কোন কোন বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে, এ ব্যাপারটাও কারোর জানা নেই। হরমোহনের প্রপিতামহ নাকি যশোহর জেলার বাৎসরিক দু হাজার টাকার আয়ের এক জমিদারের পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষক ছিলেন। মাসিক তিন টাকা বেতন এবং দু বেলার প্রধান আহার বিনামূল্যে। এই ছিল তাঁর পারিশ্রমিক। জমিদারের কন্যা নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখতে শিখেছিল। এমনকি কয়েকটি শব্দের ধাতুরূপও তার মুখস্থ হয়ে গেছিল। আর জমিদার পুত্র যশোহর জেলা স্কুল বোর্ডের পরীক্ষায় মাসিক পাঁচ টাকা জলপানি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই ছেলে কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এসে বেহেড মাতাল এবং পরদারগমনে সিদ্ধপুরুষ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। এসব সত্ত্বেও হরমোহনের প্রপিতামহকে জমিদার সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হিসাবে বিবেচনা করে 'সর্বজ্ঞ' উপাধি দান করেছিলেন।

ধারবাকিতে মুদির দোকানে জিনিস কিনতে গেলে, হরমোহন আঙ্গুলে পৈতা জড়াতে জড়াতে আত্মশ্লাঘার হাসি হাসেন, আমাদের পণ্ডিতি এক পুরুষের নয়। আমরা হলাম

গে বনেদী পণ্ডিত। লোকে অর্থ দান করে। জমি দান করে। আমরা বংশানুক্রমিকভাবে বিদ্যা দান করি। বিদ্যা না বিক্রয়ংতে। বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা প্রায় অবলুপ্তির পথে। ফলে হরমোহনের শ্লোক কতটা ব্যাকরণসম্মত এ সম্পর্কে কারোরই কোন ধারণা নেই। ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'তে', 'তং' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করলে সেটা যে সংস্কৃতই হয়, এ সম্পর্কে সবাই না জানুক, দু চারজন জানে। আর তাই মুখোমুখি দেখা হলে সকলেই হরমোহনকে পণ্ডিতমশাই বা মাস্টারমশাই বলে সম্বোধন করে।

এই যেমন এখন অবিনাশ মাস্টারমশাই বলে ডেকে নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেল। আর তখনই তার চোখে পড়ল মাস্টারমশায়ের দুটি পায়ের পাতাতেই দগদগে ঘা। মাস্টারমশায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাক টেনে কেমন মড়া পোড়ার গন্ধ পেল অবিনাশ। যদিও হালকা। কিন্তু গন্ধটা জেনুইন। ভেজাল নেই।

হরমোহনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ঠিক কতজন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো করে বা তারা কতদূর শেখে, এ বিষয়ে কাগজে কলমে কোন রেকর্ড নেই। যে ক'জন বাচ্ছা পড়তে আসে, তাদের পড়াশুনো সঠিক হচ্ছে কিনা, এ সম্পর্কে বাচ্ছাগুলির বাবা মায়েদের কোন ধারণা নেই। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা তাও নেই। ঢং ঢং করে ঘুরে বেড়াত, না হলে এর বাগানের ফল, ওর পুকুরের মাছ এইসব চুরি করে বেড়াত। পরিবর্তে বাচ্ছাগুলি হরমোহনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যও আটকে থাকে। বাবা মায়েদের কাছে এটিই বা কম লাভের কি!

বছরে তিনদিন হরমোহনের বিদ্যালয়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিদ্যালয়ের জন্মদিন। সরস্বতী পূজার দিন। আর বাংলা বছরের প্রথম দিনটিতে। অর্থাৎ ১লা বৈশাখ।

অবিনাশ বাংলা সন মাস তারিখের হিসাব রাখে না। অফিসের মাইনে, ছেলের মাস্টারমশাইয়ের মাইনে, পাওনাদারের ধারবাকি মেটানো, সবই তার ইংরাজী মাসের হিসাবে। বঙ্গাব্দের হিসাবে এখন যে ১ ১০ সাল এবং মাস চৈত্রের মাঝামাঝি এটা তার জানা ছিল না। প্রণামপর্ব সেরে যখন সে জীবিত হরমোহনের শরীর থেকে মৃতদেহের গন্ধ বেরোচ্ছে কেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, হরমোহন টপ করে ধরে গপ করে গেলার মতো, কোনরকম প্রস্তুতিপর্ব ছাড়াই বলে বসলেন, তোমার কাছে একটা আর্জি আছে।

— আর্জি? অবিনাশ বিস্মিত গলায় বলল, আমার কাছে?

হরমোহন হাসি হাসি মুখ করে ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ। তোমার কাছে। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিঞ্চিত অর্থ সাহায্য করতে হবে। শুভ নববর্ষের দিন বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েগুলির জন্যে আহার্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

অবিনাশ যত না অবাক হল, তার চেয়ে বেশী রেগে গেল। সম্মান প্রদর্শনের প্রাপ্তি যদি হয় অর্থদণ্ড, তাহলে ভাবতেই হবে হরমোহন আদৌ সম্মানযোগ্য কিনা! বরং তার মনে হল, হরমোহন অতিমাত্রায় চতুর, সুযোগসন্ধানী। অবিনাশ তাঁর অবৈতনিক

বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। হরমোহনের বাড়িতে গেছে সে সাকুল্যে পাঁচ সাত দিন। তার অবশ্য অন্য কারণ ছিল। হরমোহনের মেয়ে, শেফালী না সর্বাণী; কী যেন নাম, তাকে নিয়ে পাড়ার অবিবাহিত ছেলেদের মধ্যে তখন দড়ি টানাটানি। অবিবাহিত অবিনাশ সংস্কৃত শেখার নাম করে হরমোহনের বাড়ি কয়েকদিন যাতায়াত করেছিল। ঐ কয়েকদিনেই অবিনাশ বুঝে গেছিল, মারকাটারি দেহটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই হরমোহনের কন্যাটি একটি আস্ত নীরেট। একটু বাচাল প্রকৃতিরও। প্রতি কথাতেই হি হি করে হাসে। বুক পেট কোমরের খাঁজ যখন তখন দেখা যায়। যে কেউ দেখতে পারে। অবিনাশ বুঝতে পেরেছিল, এ মেয়ে ঘরের বউ হতে পারে না। মোটেই বিশ্বস্ত নয়। নিজের বুদ্ধি বিবেচনাতেই অবিনাশ থেমে গেছিল।

তারপর থেকে আজ এই ছ সাত বছরের মধ্যে হরমোহনের সঙ্গে অবিনাশের ক'বার দেখা হয়েছে, হাতে গুনে বলা যায়। হরমোহনের ছেলের সঙ্গে অবিনাশের প্রায়ই দেখা হয়। বাজারে, ঘড়ির মোড়ে, রেল স্টেশনে। ছেলেটি ভদ্র, বিনয়ী। দেখা হলেই হেসে ঘাড় নাড়ে। হাতে সময় থাকলে একটু আধটু গল্পগুজবও করে। সরকারী চাকরি করে। কোন্নগর না উত্তরপাড়ায়, কোথায় যেন। কালেভদ্রে হরমোহনের প্রসঙ্গ উঠলে ছেলেটি রাগে ফেটে পড়ে, বাবার কথা ছাড়ুন তো। যতসব সেকেলে ধ্যানধারণা। অবৈতনিক বিদ্যালয়। সমাজের উপকার। অবিনাশ লক্ষ্য করেছে এই সময়ে ছেলেটির চোখ মুখে রাগ আর ঘৃণা ফুটে ওঠে, নিজের ছেলেমেয়ে সংসার না দেখে, সমাজের কল্যাণকর কাজ। দ্বিতীয় মহাত্মা।

এমন ঝাঁঝালো উত্তরের পরে আর কোন প্রশ্ন করা যায় না। অবিনাশ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে দেশের হালচাল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, টিভি-র দৌরাত্মে সিনেমা হলগুলির করুণ অবস্থা এইসব বিষয়ে কথা বলে। একতরফা। অনর্গল।

হরমোহন এমন স্থির চোখে চেয়ে রয়েছে অবিনাশের মুখের পানে যেন তার দৃষ্টিতে সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। অবিনাশ কিছুতেই 'না' করতে পারবে না। অবিনাশ কিন্তু লম্বা করে শ্বাস টেনে, মৃতদেহের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি গন্ধ টের পেল। ফেরেব্‌বাজ, জমির দালাল, মিথ্যেবাদী ঘটক, কোর্টের অবিশ্বাসী মুহুরী, এদের মুখোমুখি দাঁড়ালে যে ধরণের গন্ধ লাগে, অবিকল সেই গন্ধ। হরমোহনের দেহের এই দ্বিতীয় গন্ধটা অনেক বেশি জোরালো। সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি।

— মাস্টারমশাই? অবিনাশ গলাটাকে যথাসম্ভব নরম করে বলল, এখনও তো দশ পনের দিন সময় আছে হাতে। একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনার ছেলের সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। আমার সাধ্যমত যা পারব, ওর হাতে ......।

— উঁহু-হুঁ-হুঁ। হরমোহন মাথা এবং হাত দুই-ই নাড়লেন একসঙ্গে, অর হাতে দিতে হবে না। অকালকুষ্মাণ্ড। আমি বরং তোমার বাড়ি যাব। অবিনাশ এমনভাবে ঘাড় দোলাল যাতে 'হ্যাঁ' এবং 'না' দুই-ই বোঝায়, তারপর 'আজ চলি' বলে উল্টো দিকে মুখ করে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

অবিনাশ তার বউকে পাখি পড়ানোর মতো করে শিখিয়ে দিল, কোন বুড়ো মানুষ তাঁর খোঁজ করতে এলে, তাকে 'আসুন', 'বসুন' বলে বাড়িতে না বসিয়ে, আগরাম বাগড়াম না বকে, ছোট্ট করে যেন বলে দেয়, অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে।সকাল করে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাত করে বাড়ি ফিরছে।

অবিনাশ মধ্যবিত্ত শহুরে। তায় আবার সরকারী কেরানী। বকেয়া মহার্ঘভাতার অঙ্ক কষা মাথা তার। হিসেবে কোন ভুল নেই।

তার বউ দিন দুই পরে, তার থেকে আরও দিন তিনেক পরে, রাতের বেলায় খেতে বসে বেশ করুণ গলায় বলল, আজ নিয়ে দুদিন এলো বুড়ো মানুষটা। প্রথম দিন তুমি বাড়ি ছিলে না। 'বাড়ি নেই' বলে দিলাম। আজ কিন্তু তুমি ভেতরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলে। 'বাড়ি নেই' বলতে ......! অবিনাশ লক্ষ্য করল তার বউয়ের সারা মুখ জুড়ে মেঘের ছায়া, এমন খারাপ লাগছিল না!

অবিনাশ মাথা নিচু করে একমনে খেতেই লাগল। কোন সাড়া দিল না। সে জানে বুড়োবুড়ি দেখলেই বিবাহিত মেয়েদের নিজেদের বাবা মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর এখন যদি হরমোহনের আসার কারণটা সবিস্তারে বলে, তার বউ হয়ত ফুঁপিয়ে কেঁদেই ফেলবে। পরিবেশটাকে অন্য খাতে বইয়ে দেবার জন্য অবিনাশ হঠাৎই উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আলুর দমটা গ্র্যান্ড খেতে হয়েছে। আর একটু হবে নাকি?

রবিবার ছুটির দিন। অবিনাশ একটু দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে। বাজার যেতে নটা বেজে যায়। আলমারির ড্রয়ার খুলে যখন সে বাজার করার টাকা পয়সা বার করছে, তার বউ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, একজন ভদ্রমহিলা তোমায় ডাকছে।

অবিনাশ বেশ অবাক হয়ে গেল। সাত সকালে ভদ্রমহিলা। অফিসের কোন সহকর্মী নয় তো! সে আস্তে করে বলল, ভেতরে আসতে বল। আলমারি বন্ধ করে সে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এল। কাউকে দেখতে পেল ন। গলা উঁচু করে তার বউকে ডাকল, ভেতরে আসতে বলোনি?

— আসতে রাজী হলেন না। সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে। রান্নাঘর থেকে বউ জবাব দিল।

অবিনাশ বড় বড় পা ফেলে উঠোন পার হয়ে সদরে এল। দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখল, সত্যি সত্যি একজন ভদ্রমহিলা জড়োসড়ো ভঙ্গিতে সদরের আড়ালে দাঁড়িয়ে। একটু কাছে এগিয়ে যেতেই চিনতে পারল, হরমোহন সর্বজ্ঞর মেয়ে। শেফালী না সর্বাণী কী যেন নাম। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে মেয়েটির! গায়ের রং কেমন পোড়াটে কালচে দেখাচ্ছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। সাদা চওড়া সিঁথি। মেয়েটি কি বিধবা? নাকি আজও অনূঢ়া?

অবিনাশের কি হল, নরম করে বলল, বাইরে কেন? ভেতরে আসুন। মেয়েটি প্রথমে কোন সাড়া দিল না। তারপর সংকুচিত গলায় বলল, পরশু থেকে বাবার খুব জ্বর। তাই

আমাকে পাঠালেন। একলা বৈশাখে ইসকুলের ছেলেমেয়েদের খেতে বলেছেন। সেই ব্যাপারে ......!

— ইস! এই ব্যাপারে আপনাকে ছুটে আসতে হল! আমি তো মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম ....!

— কে আসবে বলুন? অবিনাশকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি অল্প একটু হাসল, দাদা তো এসব ব্যাপারে থাকে না। ভীষণ রেগে যায়। একটু থেমে বলল, যারা পড়তে আসে তারা তো ভীষণ গরীব। আমাদের থেকেও গরীব।

নিজের অজান্তেই দুবার ঢোঁক গিলল অবিনাশ। গলার কাছটা শুকনো লাগল। সেই অবস্থাতেই কোনরকমে বলল, স্কুলটা বার মাস চলে কেমন করে? মানে মাস্টারমশাই তো তেমন কিছু করেন না।

— আমি তো সেলাইয়ের কাজ করি। তাছাড়া কাগজ ফুলের মালা, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের খাম তৈরী ......! শাড়ির আঁচল আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে মেয়েটি সলজ্জ হাসল, ওইভাবেই কোনকরমে হয়ে যায়। এতদিনের ইসকুল! অন্তত বাবা যতদিন বেঁচে আছে!

অবিনাশ বেশ বুঝতে পারল, তার নিজস্ব প্রশ্ন, জবাব, পাল্টা জবাব, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে বেশ নার্ভাস লাগছে। কোনরকমে বলল, ভেতরে আসুন।

অবিনাশ যতদূর সম্ভব শব্দ না করে আলমারি খুলল। পুরনো দেখতে সামান্য ছেঁড়াফাটা নোটগুলি থেকে বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত ভাল অক্ষত কয়েকটি নোট আলাদা করল।

আলমারি বন্ধ করে সাবধানে চাবিটিকে চাবির জায়গায় রাখতে রাখতে সে শুনতে পেল, গ্রীল ঘেরা বারান্দায় দুজন মহিলা নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

— তোমার নাম কি ভাই?

— সুপর্ণা। বাবা ডাকে অভাগী বলে।

— অভাগী? কেন?

— কে জানে!

— বাবা কী করেন?

— কিছু না। বাড়িতে একটা ইসকুল আছে। বিনা পয়সার ইসকুল। বাবা ওই ইসকুলের পণ্ডিত।

-- কী নাম তোমার বাবার?

— হরমোহন সর্বজ্ঞ। সবাই মাস্টারমশাই বলে ডাকে।

— আমার কত্তা বুঝি তোমার বাবার ছাত্র ছিল?

— না। তবে আমাদের বাড়ি কয়েকবার গেছে।

— তখন নিশ্চয়ই বিয়ে হয়নি?

— ঠিক মনে নেই।

— এখন কি দরকারে এসেছ?

— এখন, মানে ......!

— শুনুন। অবিনাশ ডাকল সুপর্ণাকে। কালো গাডার দিয়ে মোড়া কিছু টাকা সুপর্ণার হাতে দিয়ে বলল, মাস্টারমশাইকে আমার প্রণাম জানাবেন। সময় পেলে পয়লা বোশেখর দিন আমিও চলে যেতে পারি।

— তাহলে তো খুব ভাল হয়। সুপর্ণা সোৎসাহে বলল, বৌদিকেও সঙ্গে আনবেন।

সস্তার ছাপা শাড়ি জড়িয়ে পেঁচিয়ে এমনভাবে পড়েছে সুপর্ণা যেন চলতে গেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ছোট ছোট পা ফেলে সরু একফালি ছায়াকে সঙ্গী করে সুপর্ণা উঠোনটুকু পার হচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবিনাশ আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠল, সত্যি, ভাবা যায় না!

সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে অবিনাশের বউ কিছুই শুনতে পেল না। সে শুধু দেখল অবিনাশ সুপর্ণার চলার পথের পানে অপলক চেয়ে রয়েছে এবং তার ঠোঁট দুটি তিরতির করে কেঁপে উঠল বারকয়েক। মূক বধির ব্যক্তিকে সহজ স্বাভাবিক মানুষ কিছু বলতে গিয়ে যেভাবে বেশ জোরে জোরে হাত পা নেড়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে, ঠিক সেইভাবে অবিনাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একরকম চীৎকার করে বলল, আজ বাজারে না গেলেও চলবে। একটু থেমে একইরকমভাবে বলল, মেজদা মেজবৌদিকে পয়লা বোশেখের দিন নেমন্তন্ন করব। দয়া করে সেদিন একটু সকাল করে বাজারে যেও।

অবিনাশ তার বউয়ের কোন কথাই শুনতে পেল না। তার চোখের পর্দায় তখন অন্য একটি ছবি। মাটির মেঝে, ছেঁচাবেড়ার একটি ঘরে বসে কালো রোগা দুঃখী চেহারার কয়েকটি বাচ্ছা ছেলেমেয়ে সমস্বরে চীৎকার করে পড়ছে — দুই-এককে দুই। দুই দুগুণে চার। ......আ-এ আমটি খাব পেড়ে। .. ... উট চলেছে মুখটি তুলে ......। ঋষি মশায় বসেন পূজায় ......!

কৃষ্ণকথা

কৃষ্ণ? কৃষ্ণ?

ওঠো কৃষ্ণ, জাগো কৃষ্ণ।

খাটো গামছা পরে নিম দাঁতন মুখে উঠোনময় পায়চারি করছে উদাস, আর নরম সুরে ডাক পাড়ছে।

ভোর হচ্ছে। ছানা কাটা দুধের মতো খাপছাড়া আলো। এখানে একটু, ওখানে একটু। ফাঁকে ফাঁকে আবছা অন্ধকার। খুব কম লোকেরই এখন ঘুম ভেঙেছে। কৃষ্ণের ঘুম ভাঙলে এ বাড়িতে সেই হবে দ্বিতীয় জাগ্রত মানুষ।

কৃষ্ণ একটি ছোট ছেলে। বয়স সাত আট বছর। উদাসের দোকানের কর্মচারী। মালিকের কাছে খাওয়া-পরা থাকে। দৈনিক রোজ পায় আড়াই টাকা।

বাজারের চার রাস্তার মোড়ে উদাসের চায়ের দোকান। চায়ের সঙ্গে অনামী বেকারির রুটি, নানান স্বাদের বিস্কুট, সস্তার কেক। সকালের দিকে ঘুগনি, আলুর দাম পাওয়া যায়, চাহিদা অনুপাতে।

বাঁধা খদ্দেরের বাইরে চলমান মানুষজন, বাস থেকে নামছে, রিক্সা থেকে নামছে, অটো, ট্রেকার, বাস লরির ড্রাইভার, ক্লিনার, টিপওয়ালা, মাজনওয়ালা — আরি ব্বাস! উদাস তার ঘরণীকে খরিদ্দারের বিবরণ দিতে গিয়ে দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকায়, সবই ঠাকুর মায়ের ইচ্ছে। ভিড় করাচ্ছেন তেনারাই!

উদাসের ঘরণী নিরীহ মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। এই ভঙ্গিটি উদাসের ভাল লাগে।

তবে হ্যাঁ, আমার কাছে খদ্দের, খদ্দের। বড়লোক গরীব লোক, উঁচু জাত নিচু জাত, ওসব আমি বুঝি না। ঠিক কিনা বল?

সহধর্মিণী সম্মতিসূচক ঘাড় দোলায় আলতো করে। তখন উদাস আরও বেশি উৎসাহিত বোধ করে এবং বেশ শব্দ করে নিজের হাঁটুতে চাপড় মারে — এমনকি ওই হেঁদুয়ানি নিয়ে মাতামাতি করে যারা, তারাও জানে আমার দোকানে শক, হুন, মোগল, মোচলমান, পাঠান, সব এক দেহে গেল ভেসে, উঁহু মিশে, ...! শেষের দিকটা বল না, কবে পড়েছি, আর মনে থাকে?

দিন শুরুর এই সময়টায় প্রকৃতি রসস্থ থাকে। আলো বাতাস সব টাটকা সতেজ। গাছ গাছালিকে বেশি সবুজ মনে হয়। পশু পাখির ডাকও অন্য রকম। যেন সবটাই সুরে ভরা। আর তাই উদাসের মনমেজাজও এই সময় একটু অন্য রকম। তার হাঁটা

চলায় কোনও ব্যস্ততা নেই। মানুষজনকে ডাকে নরম করে। কৃষ্ণ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এলে সে কখনও কখনও তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, যা বাবা, চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। ঘুম ছেড়ে যাবে।

আসলে কি উদাস নিজেকে বোঝায়, সারাটা দিন যদি এমনিপারা হত! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, ফুরফুরে হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো যেত, সময়ে খাওয়াটি, দুপুরের ঘুমটি, ফাঁকে ফোঁকে একটু আধটু ধম্মেকম্মে মেতে ওঠা!

কোথায় কী!

ছেলেটা নেহাতই ছোট। বাপের হাত নুরকুট হতে এখনও ঢের দেরি। তা না হলে ছেলের হাতে দোকানের ভার তুলে দিয়ে, কত্তা গিন্নী ডেরা বাঁধত হরিদ্বার কিম্বা বৃন্দাবনে।

তা না, দোকান খোলা থেকে বন্ধ করা অব্দি একঘেয়ে বকবকানি খদ্দেরের সঙ্গে, থেকে থেকেই তেড়ে যাওয়া কর্মচারীকে।

আর চায়ের দোকানের কর্মচারী যেমন হয়, আজ আছে কাল নেই। উদাসের ক্ষেত্রেও তাই। দেশে শিশু শ্রমিকের অভাব নেই। সুবিধা এইখানেই যে এই জাতীয় শিশুদের মধ্যে গুণগত কোন ফারাক থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে আকার আকৃতিতেও পরপর দুজনকে একই রকম দেখতে লাগে। উনিশ বিশ ফারাক যেখানে, তা হল, একজন আরেকজনের চেয়ে হয়ত চাট্টি ভাত বেশি খায় বা আগেরজন কাজের মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক পেলেই টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত, এখনকার জন হয়ত কাজ করতে করতেই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পথচলতি কোনও শিশুর দিকে, বেলুন ওড়াতে যে তার বাবা মায়ের হাত ধরে গটমট করে হেঁটে যাচ্ছে দোকানের সামনে দিয়ে।

উক্ত এই দুই ক্ষেত্রেই উদাসকে সচেতন থাকতে হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়াটাও ঠিক কাজ নয়। উদাস একা মানুষ। সব দিকে সব সময় নজর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তাই মনের মতো কতকগুলি শব্দ তৈরি করে নিয়েছে। উগ্র দেবভক্তের দল যেমন হঠাৎ হঠাৎ 'জয় শ্রীরাম', 'কালী করালী', 'রাধে কৃষ্ণ' ইত্যাদি বলে চিৎকার করে ওঠে, উদাসও সেইরকম থেকে থেকেই 'কুকুরের এঁটো বাচ্ছা', 'রাক্ষসের জালা', 'যমের ঘুম' এইসব বলে হাঁক পেড়ে ওঠে। যার উদ্দেশে বলা, সে ঠিক শুনতে পায়। বুঝতে পারে। মুহূর্তে তার ঘুমের চটকা ভেঙে যায়। আটকে যায় মুখের গ্রাস।

আর এইসবের পরে পরেই উদাসের মনটা খারাপ হয়ে যায়। এসব তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলা। উপায় নেই, তাই বলা। তা না হলে উদাস নরম করে কথা কইতে জানে এবং কয়ও। এমনকি মজাও করে মাঝে মাঝে।

এই যেমন আজ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বার পাঁচ ছয় ডাকার পরও ছেলেটা উঠছে না দেখে, সে বন্ধ দরজায় টোকা দিল, দরজা খুলে দ্যাখ, তোর মা এয়েচে। তোকে বাড়ি নে যাবে বলে।

খুট করে খিল খোলার শব্দ পাওয়া গেল। তার মানে ছেলেটা জেগেই ছিল। উদাসের খুব রাগ হল। জেগে থেকেও তার ডাকে সাড়া না দেওয়া, এতো এক রকম তঞ্চকতা করা। যে কোন গরমিলে 'তঞ্চকতা' শব্দটি উদাসের ভারি পছন্দের। তার বাবা শিখিয়েছিল, ব্যবসায় তঞ্চকতা করবে না। প্রতিবেশী পরিজনের সঙ্গে তঞ্চকতা করবে না। এমনকি নিজের সঙ্গেও না, ইহা মহাপাপ।

উদাস তাই, কৃষ্ণ দরজা খোলা মাত্রই চড় মারার ভঙ্গিতে হাত তুলে কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল, সাড়া দিচ্ছিলি না কেন? তঞ্চকতা করা? আমার সঙ্গে?

কৃষ্ণ কচি বেড়ালের মতো মিউমিউ করে বলল, শুনতি পাইনি।

তার অস্থির দু চোখ তখন এদিক ওদিক ঘুরছে, মা কোথায়? মা?

—মা? বলে উদাস খিকখিক করে হাসল, সদরের বাইরে দাঁইড়ে আছে। দেখগে যা।

সাতসকালে তঞ্চকতাহেতু যেটুকু মন খারাপ হয়েছিল উদাসের, মিথ্যে বলে নিজেই সেটুকু সামলে নিল। এর জন্য তার গর্ব হল। যে সে লোক এটা পারবে না।

কৃষ্ণ কিন্তু সদর দরজা খুলে এদিক ওদিক বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়েও যখন তার মাকে দেখতে পেল না, তখন তার কান্না পেল এবং সত্যি সত্যি কাঁদলও সে। হাতের চেটোয় চোখের জল মুছল। তারপর তার রাগ হল। মালিকের চেয়েও মায়ের ওপর বেশি করে। তার মা তাকে দেখতে আসে না কেন, অন্য ভাই বোনদের মতো সে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমোতে পারে না কেন, দুপুরবেলায় রাতেরবেলায় সে একা একা বসে খাবে কেন, এইসব ক্ষোভ অভিমান নিয়ে তার সকাল শুরু হল। আর এসব সে যত ভাবতে লাগল, দৈনন্দিন কাজগুলোয় তত ভুল হতে লাগল। সে দোকানঘর ঝাঁট দিল, জল ছড়া দিতে ভুলে গেল। মালিকের বকুনি খেল। উনুনটা তখনও ভাল করে জ্বলেনি, কাঁচা কয়লার ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সে ঝপ করে চায়ের ডেকচিটা বসিয়ে দিল তার ওপর। মালিকের কানমলা খেল। প্রতিদিনের অভ্যাস সত্ত্বেও ছটা আটটা এঁটো চায়ের গ্লাস বুকের সঙ্গে লেপ্টে নিয়ে যেতে গিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল অল্পের জন্য। টুলে বসেই মালিক তাকে হুংকরা দিয়ে ডাকল, উল্টোমুখো বাচ্ছা, এদিকে আয়।

সে কাছে যেতেই মালিক তাকে চড় থাপ্পড় মারল না, কানমলা দিল না. বরং তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল হাসতে হাসতে, মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছিস কোন মুখো হয়ে? জানিস না? মাকে জিজ্ঞেস করিস তো।

তা শুনে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে একজন খদ্দের তাকাল উদাসের মুখের পানে। পরে আপাদমস্তক দেখল কৃষ্ণকে। ছ্যাৎলাধরা দাঁত বের করে হাসল মজুর শ্রেণীর দুজন মানুষ। মাঝবয়সী টাক মাথাওলা একজন লোক ঠক করে আধ খাওয়া চায়ের গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর, পয়সাটা নিয়ে যান।

কৃষ্ণ পয়সা নেওয়ার জন্য টেবিলের কাছে এগিয়ে যেতেই উদাস ধমকে উঠল, আঃ! নিজের কাজ কর।

পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল খদ্দেরের দিকে চেয়ে, দামটা এক হাতেই নিয়ে থাকি।

উদাসের ভাল লাগছিল দুজন মানুষের হাসি দেখে। একজনের নির্লিপ্ত চাউনিতে এবং একজন খদ্দেরের দ্রুত জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। তার মানে কৃষ্ণকে নতুন সম্বোধনে ডাকটা তার সঠিক স্থানোপযোগী হয়েছে। এটা বড় কম কথা নয়। সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এর মধ্যে।

ছেলেটা যদি সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করে ওর মাকে, কোনমুখো হয়ে ...!

উদাস জিভ কাটল। শব্দহীন হাসল। এক ফাঁকে দু-দণ্ড চোখ বুজে কৃষ্ণের মায়ের চেহারাটা ভাবল। বিয়োবার মতো শরীরের ধকল এখনও নিতে পারে।

অভাবী? খেতে দিতে পারবে না? ফুঃ ...!

আপন মনেই বলল, ধুস! ওদের ঘরে আটটা দশটা কোনও ব্যাপারই নয়।

অন্য ছুটির দিনগুলির মতোই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানে ভিড় বাড়তে লাগল। নিয়মিত খদ্দেররা এল। তাদের নির্দিষ্ট টেবিলগুলি ঘিরে বসল। অনিয়মিত খদ্দেররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেল। ঘুগনি, আলুর দম খেল যারা, বাঁধা খদ্দেরদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে তাদের জায়গা করে দিল। খবরের কাগজটি ঘুরতে লাগল, এ টেবিল ও টেবিলে, ভিড় সামলাতে উদাসের হিমসিম অবস্থা। আবার তার মাঝেই কৃষ্ণকে চোখে চোখে রাখা, যেন চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে কাজ করতে করতে ছেলেটা দু-দণ্ডের জন্যও দাঁড়িয়ে না পড়ে। এইসব সাত সতেরো ঝক্কি ঝামেলায় উদাস বিরক্ত হয়ে ওঠে। তা থেকে ক্লান্তি আসে। আর তখনই হরিদ্বার বৃন্দাবনে ডেরা বাঁধার ভাবনাটা মনে আসে। এ কাঠামোয় কি আর হবে!

এর মধ্যেই কৃষ্ণ আরও কয়েকবার অন্যমনস্কের মতো কাজ করল।

টেবিল মুছল। আলুর দমের দাগ লেগে রইল। গ্লাস ধোয়ার জন্য চৌবাচ্চার গায়ে লাগানো কলটা বন্ধ করতে ভুলে গেল একবার। কিছুটা জল পড়ে গেল ছরছর করে। ঝাঁট দেওয়ার আগে ফ্যানের সুইচ বন্ধ করল, আর কোন ফাঁকে যে টিউবটা জ্বালিয়ে বসল, কে জানে! দিনের খটখটে আলোয় সেটা উদাসের নজরে পড়ল যখন, তখন দশ বিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। ছেলেটা এমনি গা-ছাড়া ভুলো কাজ কোনদিন করে না। তা বলে এতটা মেনে নেওয়াও তো উদাসের পক্ষে সম্ভব নয়। সে মুখে কিছু বলল না, মনে মনে ছক কষতে লাগল, দুপুরে দোকান বন্ধের আগে পাঁচ সাত মিনিট ফ্যানের হাওয়ায় জিরোয় যখন সে, এক্কেবারে নতুন একটি সম্বোধনে কৃষ্ণকে ডাকবে। ছেলেটা ভিতু ছাগলের মতো গুটি গুটি পায়ে কাছে আসা মাত্রই এক লাথি কষাবে! তবে পেট চেপে নয়। পাছায়। তাতে বিপদের ঝুঁকি কম। থানা পুলিশ হবে না।

ছেলেটার কাঁদুনে স্বভাব নয়। বড় জোর পলকহীন চোখে চেয়ে থাকবে মালিকের

মুখের পানে। কাউকে কিছু বলবে না। দুপুরে খাবে। বিকালে দোকান খোলা থেকে রাতে বন্ধ করা অবধি ঠিক ঠিক কাজও করবে। গুণ আছে ছেলেটার। আছে বলে এখনও টিকে আছে। উদাস তাই যখন তখন ধমকে চড় থাপ্পড় মেরে ছেলেটাকে শোধরাবার চেষ্টা করে। লাথি মারা মানে তো আর সত্যি সত্যি লাথি মারা নয়। ভুল করেছে, সমঝে দেওয়া। ওরই ভালর জন্য।

কৃষ্ণ? এই কৃষ্ণ?

গেল কোথায়? দুপুরে দোকান বন্ধ করে দুজনে একসঙ্গে ফেরে। রাস্তায় সামান্য আগে পিছু। উদাস দোকানের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাল। তিনদিকের তিনটি রাস্তা সটান শুয়ে রয়েছে। শুধু চতুর্থ রাস্তায় খানিকটা দূরে কিছু মানুষের ভিড়। উদাস কান খাড়া করে শুনল খোল করতাল বাজছে।

সে পাশের দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, কৃষ্ণকে দেখেছ ভাই?

উঁহু। পাশের দোকানি চতুর্থ রাস্তা বরাবর চেয়েছিল, নাম সংকীর্তন বেরিয়েছে উদাসদা। দে পাড়ার দিকে চলে যাচ্ছে।

উদাসের কোনও আগ্রহ জন্মাল না। সে দোকানের মধ্যে ফিরে এল। একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই মনে হল দেব দ্বিজকে অগ্রাহ্য করা ঠিক কাজ নয়। চোখ বুজে কপালে হাত ঠেকিয়ে উদ্দেশ্য প্রণাম শুরু করল।

উদাস ঠিক কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকত বলা মুশকিল। কারণ একবার বলতে শুরু করলে ঠাকুর দেবতার কাছে কত কী বলার আছে! হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো পায়ের শব্দে সে চোখ খুলে তাকাল এবং সব কিছু ঠিকমত ঠাওর করে উঠল যখন, দেখল কৃষ্ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে, পেসাদ।

আর প্রসাদী বাতাসা ঢালু ক্যাশবাক্সের ওপর যাতে গড়িয়ে না যায়, তাই সাবধানে হাত দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে উদাস এইটুকু দেখল। আর তাতেই তার মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠল। সে কোনরকম হিসেব না করেই সজোরে পা চালাল কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। পেটে না পাছায় লাথিটা কোথায় লাগল, বোঝা গেল না। ছেলেটা বাতাস খামচে গেলার ভঙ্গিতে গপ করে আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। তারপর টাল রাখতে না পেরে ঝপ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

উদাস কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। বরং সে খুব স্বাভাবিকভাবে ফ্যানের গতি বাড়িয়ে দিল। ফতুয়া নেড়ে চেড়ে দু চারবার উঃ আঃ করল। তারপর কর্কশ গলায় ডাকল, এই চামচিকে, ওঠ। ওঠ বলছি।

কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল। তার দু চোখ লাল। ওপরের ঠোঁটটা ফুলে উঠেছে।

উদাস ভাল করে দেখে নিল, রক্তটক্ত বেরোয়নি। যাক রক্ষে।

দুপুরে উদাসের বাড়ির কাজের মেয়েটি যখন উঠোনের এক কোণে কৃষ্ণর ঘরে

তার নির্দিষ্ট থালাটিতে ভাত তরকারি ঢেলে দিতে এল এবং প্রতিদিনের মতই নিচু গলায় নরম করে ডাকল, ভাই, এই ভাই, থালাটা দে। কৃষ্ণ কোনও সাড়াশব্দ দিল না। গোঁজ হয়ে শুয়ে রইল উল্টোদিকে মুখ করে। তখন কাজের মেয়েটি এদিক ওদিক দেখে কৃষ্ণর ঘরের মধ্যে ঢুকে, নিজেই জানালার বেড় থেকে থালাটি নামিয়ে এনে ভাত তরকারি উপুড় করে ঢেলে দিল তাতে। তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। ভাতগুলো করিয়ে যাবে।

কৃষ্ণ কিন্তু শুয়েই রইল। খেল না। ভাতের থালার দিকে তাকাল কয়েকবার। পিঁপড়ে ঘিরে ফেলছে থালাটিকে, দেখেও সে উঠল না। কেন মালিক তাকে লাথি মারল, সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। লোকের ভিড় ঠেলে খামচাখামচি করে সে তো প্রসাদ নিয়ে এসেছিল মালিকের জন্যই। তাহলে?

বিকালে সব দেখেশুনে উদাস শুধু মুখ দিয়ে আওয়াজ করল, হুম্। কৃষ্ণকে ডাকল না। দোকানে যাওয়ার কথাও বলল না। কেবল ছেলেটা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, এই ভেবে বাইরে থেকে ঘরের দরজার শেকল তুলে দিল।

অন্ধকার ঘরে সারারাত শুয়ে রইল কৃষ্ণ। আর আশ্চর্য! খিদে তেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমের মধ্যে হিজিবিজি স্বপ্ন দেখল। একবার দেখল তাদের বাড়ির পিছনের পুকুরপাড় ধরে সে লুট করা একটা ছেঁড়া ঘুড়ি হাতে ছুটছে। তার পিছনে তার বয়সী অনেক ছেলে ছুটে আসছে। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তখনই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল ঘরের দরজায় ঠকঠক করে টোকা মারছে মালিক আর তার নাম ধরে ডাকছে, ওঠো কৃষ্ণ। সকাল হয়ে গেছে।

পাশের বাড়িতে রেডিও বাজছে তারস্বরে।

কৃষ্ণ দরজা খুলল এবং অবাক হয়ে দেখল উঠোনে দরজার পাশে তার মা দাঁড়িয়ে রয়েছে জড়োসড়ো হয়ে। সে মায়ের কাছে ছুটে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। তার মা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, রোনে না। রোনে না।

প্রতিদিনের মতোই উদাস খাটো গামছা পরে নিম দাঁতন হাতে উঠোনের এদিক যাচ্ছে। ওদিক যাচ্ছে। এটা নড়াচ্ছে। ওটা সরাচ্ছে।

নাজমা বিবি ডাকল, মালিক?

উদাস প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, উঁহু। ও ছেলে তুমি নিয়ে যাও।

মালিক, ফির কাজ কাম না পেলে ....!

— আঃ! এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠল উদাস, তোমার মুখ চেয়ে জাত ধম্মের তোয়াক্কা না করে ওকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। নাকি?

— হ্যাঁ।

— কোনও অযত্নি করিনি। শুধু নামটা পাল্টে দিয়েছিলুম। মহম্মদ থেকে কৃষ্ণ।

— সাচ মালিক।

তা বলে ধম্মটম্ম কি সব লোপাট হয়ে গেছে? উদাসের দু চোখ ঘুরতে লাগল বনবন করে, তুমি জান না। বুঝবে না। একে বলে ষড়যন্ত্র। তা না হলে হিন্দু দেবদেবীর পেসাদ একটা মোচলমানের ছেলে নিয়ে এসে রাখছে কোথায়? না, ক্যাশবাক্সের ওপর! একটু থামল উদাস, আমার লক্ষ্মী, আমার ব্যবসা সব ধ্বংস হয়ে যাক, তাই চাও?

মহম্মদ হাঁ করে চেয়ে আছে উদাসের দিকে। চড় থাপ্পড় কানমলা খেলে সে যেমন করে চেয়ে থাকে। নাজমার দু চোখ জলে ভরে গেছে। সে তো মাসান্তের পঁচাত্তর টাকা, মহম্মদের খাই খরচ এসবের কথা ভাবছে। উদাস শব্দ করে মুখ ধুল। পুব দিকে তাকিয়ে সূর্য প্রণাম করল। পাশের বাড়ির নারকেল গাছের পাতার ফাঁকফোঁকর দিয়ে ঝুনো নারকেল দেখল। তারপর নাজমার দিকে চেয়ে হাসল, কিছু করার নেই। দেশের খবর তো রাখ না। এই অব্দি বলে একটু চুপ করল। তারপর আবার হাসল। একটু অন্যরকম হাসি, এই বুড়োটাকে ভুলো না। দরকার টরকার হলে তুমি আসবে। কোনও কিন্তুকারি রেখো না মনে।

মহম্মদ বস্তিতে তার নিজের বাড়িতে ফিরে এল। সপ্তাহ দুই মহা আনন্দে কাটল তার। বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট করল। রাতে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমোল। আবার তার মাতাল বাবা বাড়ি ফিরে মাকে ধরে পিটল যখন, সে অন্য ভাই বোনদের সঙ্গে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখল।

ইতিমধ্যে তার মা আবার একটি নতুন কাজের সন্ধান আনল তার জন্য। জি. টি. রোডের ওধারে। এটিও একটি চায়ের দোকান।

একদিন সে মায়ের সঙ্গে নতুন কাজের জায়গায় চলল। তখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে। পাতলা তালশাঁসের মতো চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়ে। আর মাথার ওপর দিয়ে কতরকম পাখি উড়ে যাচ্ছে ডাকতে ডাকতে।

মায়ের হাত ধরে হাঁটছিল মহম্মদ। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মা, কাম ফতে ঘর আসবি। হররোজ। বলে মা আকাশের দিকে চেয়ে ছেলেকে দেখাল, দেখ, ওহি যো পঞ্ছী ঘর আসছে, ওই মাফিক।

মহম্মদের খুব আনন্দ হল। আবার কাজে যেতে হচ্ছে বলে তার আর কোনও দুঃখ রইল না। সে রীতিমত লাফাতে লাফাতে চলল।

নতুন মালিক বেরিয়ে এল দোকান ছেড়ে। নাজমার দিকে চেয়ে বলল, আমার এখেনে পাঠাল কে?

— শুনছিলাম মালিক। দিলীপ আজিজ ওইসব বলল।

জবাবটা নতুন মালিকের পছন্দ হল না। কিন্তু তারপরেও সে নাজমাকে ধার থেকে পাশ থেকে এমনকি সোজাসুজি দেখল কয়েকবার। আর তাতে নাজমাকে তেমন অপছন্দও হল না তার। তখন সে বেশ সোহাগের ভঙ্গিতে মহম্মদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, এত দূর থেকে ঠিক সময়ে আসতে পারবি রোজ? ছেলের আগেই মা মাথা নাড়াল, হ্যাঁ। হ্যাঁ।

মালিক এবার মহম্মদের থুতনি ধরে নেড়ে দিল, তোর নাম কি বাছা?

মহম্মদ চুপ করে আছে দেখে নাজমা ছেলেকে আস্তো ঠেলা দিল, বোল, নাম বোল।

মহম্মদ মাথা নিচু করে অস্ফুট গলায় বলল, কৃষ্ণ মহম্মদ।

মালিক চমকে উঠল, এমন নাম বাপের তো বাপের জন্মে শুনিনি। তখন নাজমার মুখ জুড়ে লাজুক হাসি, ওই নামই আছে। আপনি সুবিস্তামত ডাকবেন।

ঘরে ফেরার পথে মা ছেলে দুজনাই চুপচাপ। নাজমা ভাবছে, আর ভয় নেই। কাজটা হবেই। তবে হ্যাঁ, ছেলেটারও বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

মহম্মদ কিভাবে যেন বুঝতে পেরে গেছে, আগের মালিক তাকে লাথি না মারলে, সে কখনই নিজে নিজে নামটা পাল্টাতে পারত না।

--- মা?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নাজমা ফিরে তাকাতেই মহম্মদ হাসল,

কৃষ্ণ মহম্মদ। এই নামই ভাল। বলো মা?

অহংকার

(এক)

নীরজা আস্তো করে মেয়েকে ডাকলেন, অনু? ঘুম এসে গেছে?

— না। অনু স্পষ্ট করে জবাব দিল, গরম করছে। জানলাটা খুলে দেব?

— খুলবি? নীরজা সামান্য ইতস্তত করলেন, পুরোটা খুলিস না। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

অনুর পরণের শাড়ি অবিন্যস্ত। সেই অবস্থাতেই সে বিছানা থেকে নেমে জানলা খুলতে গেল। নীরজা ঘাড় কাত করে মেয়েকে দেখলেন। লম্বা, বেশ রোগা। ব্লাউজের মধ্যে অপুষ্ট বুক দুটির অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। নাভির কাছ বরাবর শ্বেতীটি যেন আকারে আর একটু বড় হয়েছে। যেটুকু লালচে ভাব ছিল, তা মুছে গিয়ে জলে ভেজা কাগজের মতো ফ্যাকাসে শাদা দেখাচ্ছে। নীরজা চোখ বুজে দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে নিলেন। লম্বা একটি শ্বাসকে সন্তর্পণে মুখ ফাঁক করে আস্তে আস্তে ফেললেন। যাতে কোনরকম শব্দ না হয়।

তিনজনের সংসার। মা নীরজা। মেয়ে অনু। আর নীরজার শ্বশুর, অনুর দাদু, সিদ্ধেশ্বর। নীরজার স্বামী অতুল মারা যায় যখন, অনুর বয়স ছয়। স্কুলে ভর্তি হবে অনু, সব ঠিকঠাক। অতুল মারা গেল হঠাৎই। অনুর ভর্তি হওয়া পিছিয়ে গেল। অতুল কোন দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। মারা গেছে অসুখে। অমন কঠিন রোগ একা গোপনে বয়ে বেড়িয়েছে অতুল! বাড়ির কাউকে কিছু বলেনি। এমনকি নীরজাকেও না। কেবল সহকর্মী অজয়কে নাকি একবার বলেছিল, আর পারি না ভাই। বড় কষ্ট।

অজয়ের ধারণা হয়েছিল, কষ্ট বলতে মনের দুঃখ কষ্ট। স্বল্প রোজগেরে মানুষদের যা হয়। অজয় কোন জবাব দেয়নি। অনেক পরে, অতুল তখন মারা গেছে বছর দুয়েকের ওপর, কথা উঠতে অজয় বলেছিল নীরজাকে, সেদিন বুঝতে পারিনি বৌদি। অতুলদার কথা শুনে মনে হয়েছিল, অল্প মাইনেতে আর সংসার টানতে পারছিল না। সেই কষ্টের কথাই বুঝি বলছে।

অজয়ের জবাবের পিঠে নীরজা কোন কথা বলেনি। সে তো জানে, বিয়ের পর থেকেই দেখছে, বাবা ছেলে দুজনেই অসম্ভব অন্তর্মুখী। কোন অসুবিধার কথাই ভেঙ্গে কাউকে কিছু বলবে না। এক ধরণের অহংকার। এরা নিজেরা কষ্ট পায়। অন্যদের কষ্টে ফেলে রেখে যায়।

অতুল প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করত। পেনশন নেই। জমানো পুঁজির পরিমাণও অল্প। অতুলের জায়গায় নীরজাকে চাকরি দিতে রাজি হল কোম্পানীর মালিক। বাধ সাধলেন নীরজার শ্বশুর। বাড়ির বউ চাকরি করতে বেরোলে, বংশের অমর্যাদা হবে।

নীরজা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন, চাকরিটা নিয়ে অনুকে সঙ্গে করে বাপের বাড়ি চলে যাবেন। আতান্তরে পড়ে শ্বশুর যখন তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হবেন, মানিঅর্ডার করে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবেন। ভুলেও এ বাড়িমুখো হবেন না। এ বাড়িতে ফিরে এলে অনুকে মানুষ করতে পারবেন না।

সিদ্ধেশ্বরের বাধায় নীরজাকে আটকানো যায়নি। নীরজার জেদ যত বেশী প্রবল হচ্ছিল, বাধা দেওয়ার জন্য অন্য কোন উপায় অনুসন্ধানে সিদ্ধেশ্বরের প্রাণান্তকর চেষ্টা তত বেশী ব্যর্থ হচ্ছিল। গোপনে সিদ্ধেশ্বর পুরনো যজমানদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। কেউ কোন আশ্বাস দেয়নি। গঞ্জের কারবারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, হিসাবপত্র লেখালিখির কাজের জন্য। একে তো সিদ্ধেশ্বরের বয়স বেশী, স্বাস্থ্য দুর্বল, তার ওপর সেকেলে পণ্ডিত হিসাবে সৎ মানুষ বলে পরিচিত। কোন ব্যবসায়ী তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারেনি। সিদ্ধেশ্বর বংশমর্যাদা সম্পর্কে যতই রক্ষণশীল হোন না কেন, এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, তিনটি মানুষের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য বাঁধা কিছু অর্থের নিয়মিত যোগান প্রয়োজন। তাঁর বিচারে স্ত্রীলোকের চাকরি করা উচিত কাজ নয়। কিন্তু বাঁচার তাগিদে, নীরজা অর্থ উপার্জনের জন্য যদি অন্য কেনা পথ বেছে নেয়! সে হবে এক অভাবনীয় কষ্টের। সীমাহীন লজ্জার ব্যাপার। দিনকাল বদলে গেছে এই ধারণা থেকে নয়, অনন্যোপায় তাই, এইরকম যুক্তিতে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছেন সিদ্ধেশ্বর।

নীরজা যেদিন প্রথম চাকরিতে বেরোয়, পাছে নীরজার প্রণাম নিতে হয়, এই অপ্রীতিকর অবস্থাটা এড়াবার জন্য সিদ্ধেশ্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাতসকালে হেমেন ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে বসেছিলেন। সেখান থেকেই ব্যাগ হাতে নীরজাকে সাবধানে রাস্তা পার হতে দেখে তাঁর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। পথেঘাটে শুধু কি মানুষের ভয়! আরও কতরকমের বিপদ, কত ধরণের ভয়! নীরজার দিকে চেয়ে অস্ফুটে বিড়বিড় করেছিলেন, জয় মা দশভূজা। সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা কোর।

মায়ের অনুপস্থিতিতে দাদুর সান্নিধ্যে অনুর বড় হয়ে ওঠা। স্কুল পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হল যখন অনু, নীরজা অনুর বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করলেন। অনুর গার্জেন বলতে তো তিনিই। সিদ্ধেশ্বরের অস্তিত্ব সেকেলে আসবাবের মতো। বেমানান অচল, তবু আছে। পুরনো দিনের এই আত্মম্ভরিতাটুকু বাদ দিলে অবশিষ্ট কিছুই নেই। সিদ্ধেশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী অনু বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। নীরজার ইচ্ছে ছিল না। ইকনমিক্স বা ইংরাজীতে অনার্স নেওয়ার যোগ্যতা অনুর ছিল। অফিস থেকে ফিরে নীরজা প্রায়ই দেখেন, দাদু নাতনি মুখোমুখি বসে 'বৃত্রসংহার', 'মাধবীকঙ্কণ', 'সারদামঙ্গল', এইসব সেকেলে লেখা নিয়ে আলোচনা করছে। নীরজা একদিন মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কলেজের পড়াশুনো মন দিয়ে করছিস তো?

মেয়ে অবাক গলায় বলল, কেন বল তো?

— কলেজের বই নিয়ে তো বসতে দেখি না। নীরজা থেমে থেমে বললেন,

সবসময়েই তো দাদুর সেকেলে বইগুলো নিয়ে ......।

— ওঃ! তাই বল! বলে অনু এমন একটা ভঙ্গি করল, যার মানে মায়ের প্রশ্ন করার কারণটা সে ধরতে পেরেছে। প্রশ্নটা যেন নেহাতই অহেতুক অর্থহীন, এটা ধরে নিয়েই তাচ্ছিল্যের সুরে কেবল 'ওঃ'-ই বলেনি। তারপরেও যোগ করেছে, 'তাই বল!'

নীরজার মন খারাপ হয়ে গেছিল। আবার সাহস করে কিছু বলতেও পারেননি মেয়েকে। বাপ মরা মেয়ের সঙ্গে মায়ের যে সখ্যতা জন্মায়, অনু কখনই তাঁর অতটা কাছের হয়নি। দাদু বাবার মতো অনুও চাপা স্বভাবের। পাড়াতে অনুর বিশেষ কোন বান্ধবী নেই। কলেজের কোন সহপাঠীও আসে না বাড়িতে। অনু যেন নিজের মধ্যেই রয়েছে সর্বক্ষণ। কথা বলে কম। হাসে কদাচিৎ। কোন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত হ্যাঁ, না, করার প্রয়োজনও বোধ করে না। নিজের সম্পর্কেও এতটুকু সচেতনতা নেই। উঠতি বয়সের মেয়ে এমন বিসদৃশ লম্বা, তার ওপর নাভির কাছে ক্রমবর্দ্ধমান শ্বেতী, অনু যেন এসবের কিছু নিয়েই এতটুকু চিন্তিত নয়! কোন কোন একা মুহূর্তে অনুর কথা মনে পড়লে, নীরজার দুঃখের পরিবর্তে রাগ আসে মনে। হুবহু এই বংশের ধারাবাহিকতা অনুর রক্তে। কিছু নেই, তাতেই দম্ভ, অহংকার। আপন মনেই ব্যঙ্গের হাসি হাসেন নীরজা। বিয়ের পরে অতুলও সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে বলেছিল, বন্ধুর বউয়েদের শাড়ি গয়না দেখে বিচলিত হোয় না। ওদের যা নেই, তোমার তা আছে। একটু থেমে বলেছিল, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড। বাবাকে নিয়ে সাত পুরুষের পণ্ডিতের বংশ আমাদের। ভিখারীর আত্মমর্যাদা বোধ থাকতে পারে। নীবজা মনে মনে ভাবেন, কিন্তু তা কতক্ষণ? কতদিন? পরনের ছেঁড়া কানিটুকু চলে গেলে তখন সে উলঙ্গ। শুধুই লজ্জা।

নীরজা জানেন, অনুকে এসব কথা বলতে যাওয়া অর্থহীন। অনু বুঝলেও মানতে চাইবে না। পথেঘাটে লাবণ্যময়ী চঞ্চল কোন কিশোরীকে দেখলে নীরজার, অনুর মুখটা মনে পড়ে যায়। তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হয়। তাঁর অবর্তমানে অনুর ভূত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় আসে মনে।

ক্যাশ সেকশনের শুভেন্দুকে একদিন নীরজা তাঁর এই ভয় মনখারাপ ক্লান্তির কথা সব বলল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। শুভেন্দু ছেলেটা বেশ প্রাণবন্ত। অফিসের যে কোন সহকর্মীর বিপদে আপদে সবার আগে ছুটে আসে। পাশে দাঁড়ায়। বুদ্ধি পরামর্শ দেয়। খুঁটিনাটি খোঁজখবরও রাখে অনেক। নীরজার মুখে সব শুনেটুনে, 'ওঃ! এই ব্যাপার'! বলে এমন হাসল যেন নীরজা তাকে দূরপাল্লার কোন ট্রেনের টাইম বা অনুষ্ঠানবাড়িতে জগন্নাথ ঘাট থেকে সস্তায় ফুল আনা যায় কীভাবে, এই জাতীয় কোন কাজের দায়িত্বের কথা বলছেন।

— তুমি বুঝতে পারছ না! আর্ত অসহায়ের মতো শোনায় নীরজার গলা।

— দূর! দূর! এটা আবার কোন প্রবলেম নাকি? শুভেন্দু হেসে বলল, বুড়ো দাদুর টাচে থেকে, আপনার মেয়ের নিজস্ব কোন চিন্তাভাবনার জগৎ গড়ে ওঠেনি। ইটস্ অ্যান এনভায়রামেন্টাল ক্রাইসিস। অন্য রকম আলাপ আলোচনা, সঙ্গ বন্ধুত্ব পেলে, দেখবেন

আপনিই অ্যামবিশাস হয়ে উঠছে। নিজের সম্পর্কে সচেতনতাও বাড়ছে।

আশ্চর্য! অফিস ফেরতা নীরজার সঙ্গে শুভেন্দু যেদিন প্রথম এল এ বাড়িতে, হৈ চৈ করে গল্প করল, সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে একাল সেকালের ভাল মন্দ নিয়ে তর্কবিতর্ক করল, শচীন কত্তাকে নকল করে নাকী গলায় 'শুকোতিরও মাঝে মুকোতি যেমনি/তেমনি আমারে তুমি ... তুমি শুধু তুমি' গান শোনাল এবং বিদায়বেলায় অনুর দিকে চেয়ে হাসল, আর একদিন আসব, সেদিন অনেক জোকস্ শোনাব। নীরজা চমকে উঠলেন। যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। শুভেন্দুর কথার প্রত্যুত্তরে অনু দুচোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করছে, কবে আসবেন? ঠিক করে বলুন, কবে? নীরজা চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালেন। সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পেলেন না। চোখ বুজে লম্বা করে শ্বাস ফেললেন, বাবাঃ!

শুভেন্দুর অনুমান যথার্থ। মাঝে মধ্যে যেদিন সে আসে, নীরজা লক্ষ্য করেন, মুহূর্তে অনুর মধ্যে কত কিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়। অনু শব্দ করে হাসে। শুভেন্দুর কথার মাঝে 'তাই নাকি', 'সত্যি' এইসব প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহার করে শুভেন্দুকে রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। রান্নাঘরে চা করতে করতে নীরজা একদিন স্পষ্ট শুনেছেন, পাশের ঘরে নিচু গলায় শুভেন্দু কী যেন বলতেই, অনু ছন্দোময় অনুচ্চ হেসে গাঢ় গলায় বলল, আর একবার। গোড়া থেকে, প্লীজ।

গত সপ্তাহে শুভেন্দুকে একদিন গলির মুখ অব্দি এগিয়ে দিয়ে এসেছিল অনু। সিদ্ধেশ্বর বেশ কড়া গলায় অনুকে, কোথায় গেছিলে? জিজ্ঞেস করতেই অনু সপাটে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কেন বল তো?

— রাত হয়ে গেছে কিনা! সিদ্ধেশ্বরের বলার ভঙ্গিতে ধরা পড়ে যাচ্ছিল তাঁর হতচকিত বিস্মিত ভাব।

— তাতে কী হয়েছে? অনুর উদ্ধত জবাবে নীরজা রীতিমত বিব্রত বোধ করছিলেন। সিদ্ধেশ্বরের করুণ চোখ দুটির দিকে চেয়ে নীরজার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। তিনি ধমকের সুরে অনুকে বললেন, ছিঃ! দাদুর মুখে মুখে তর্ক করছ!

সামনে ঝুঁকে ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর। নীরজার মনে হল সিদ্ধেশ্বরকে বৃদ্ধ শাজাহানের বেশে অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো দেখতে লাগছে।

অনুর দিকে চেয়ে নীরজা রীতিমত গর্জে উঠলেন, দাদুর থেকে ক্ষমা চাও। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে হাসলেন সিদ্ধেশ্বর, কী যে বল বৌমা! কী এমন ঘটেছে! কে ক্ষমা চাইবে!

মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে সিদ্ধেশ্বর নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। অনু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে একবার মায়ের মুখের দিকে, পরমুহূর্তে দাদুর চলার দিকে দেখতে লাগল।

(দুই)

নীরজার কথামত অনু জানলাটা অর্ধেক না খুলে পুরোপুরি খুলে দিল। পাল্লা দুটি

দুপাশের দেওয়ালে ঠকাস করে লাগল। নীরজা বিরক্তিভরা গলায় বললেন, একটু আস্তে। অনেক রাত এখন। অনু বিছানায় ফিরে এল। উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে অস্ফুটে বলল, কী এমন শব্দ হয়েছে! একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার সবেতেই বিরক্তি।

নীরজার রাগ হল। কিন্তু নিজেকেই নিজে শাসন করলেন, চুপ। নীরজার ঘুম আসছে না। হিজিবিজি চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একসময় তাঁর নিজেরই মন হল, সত্যি বেশ গরম লাগছে। পাশে শুয়ে অনুও যে ঘুমোচ্ছে না, তাঁরই মতো জেগে রয়েছে, এটা বুঝতে পারলেন। এমন বিনিদ্র রাত নীরজা আগেও অনেক কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গায়ে গা লাগিয়ে আর একজন শুয়ে রয়েছে এবং সেও অনিদ্রিত, অথচ কেউ কারোর সঙ্গে একটি কথাও বলছে না, এ এক অসহনীয় অবস্থা। নীরজা হাঁফিয়ে উঠলেন। এমন দমবন্ধ অবস্থায় একটু আলো হাওয়া দরকার।

নীরজা আস্তে করে তাকালেন, অনু?

— হুঁ।

— আজ কলেজ থেকে ফিরলি কখন?

— কলেজ যাইনি।

— যাসনি? কেন?

— বেরোতে যাব, সেই সময় শুভেন্দুদা এল।

নীরজা চমকে উঠলেন। তার অনুপস্থিতিতে শুভেন্দু এসেছিল। হঠাৎ করে মনে পড়ল, গতকাল শুভেন্দু একদিনের ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত হাতে নীরজার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, একদিনের ছুটি নিচ্ছি। এমনভাবে বলেছিল যেন শুভেন্দুর ছুটি মঞ্জুর হওয়া না-হওয়া, সব কিছু নির্ভর করছে নীরজার ওপর। নীরজা হেসে বলেছিল, আমি কি তোমার লিভ গ্রান্টিং অথরিটি?

— না, এমনি বলছি। শুভেন্দু হেসে বলেছিল, আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। তাই জানিয়ে রাখলাম।

তার মানে নীরজার অফিস যাওয়ার ব্যাপারটা কনফার্ম কিনা, শুভেন্দু যাচাই করে নিয়েছিল।

নীরজা নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন, হঠাৎ কোন দরকারে এসেছিল বুঝি, শুভেন্দু?

— না, এমনি। যেমন আসে। অনু সহজ গলায় জবাব দিল।

— কতক্ষণ ছিল?

— ঘড়ি দেখিনি। তা অনেকক্ষণ হবে। অনুর গলার স্বরে কোন আড়ষ্টতা নেই।

— বাবা! যা বকতে পারে! যেন শুভেন্দুর অনর্গল কথা বলে যাওয়ার ব্যাপারটা নীরজার বিরক্তিকর মনে হয়, মাথা ধরে যায়।

অনু এ কথার কোন জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নিশ্চুপ। একসময় নীরজাই আবার কথা শুরু করলেন, আবার কবে আসবে, কিছু বলল?

অনু প্রথমে একটা লম্বা শ্বাস ফেলল। তারপর নির্লিপ্তের মতো করে বলল, আর আসবে না। একটু থেমে বলল, আমি বারণ করে দিয়েছি।

নীরজার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, তুই বারণ করে দিয়েছিস? কেন?

— আমার ভাল লাগবে না। অনুর গলায় বিরক্তি, তাই!

নীরজার মুখের ভেতরটা শুকনো লাগতে লাগল। ঢোঁক গিলতে গিয়ে মনে হল গলার কাছে শ্লেষ্মা জড়িয়ে যাচ্ছে। শুভেন্দুকে ঘিরে নীরজা একটি ভাবনার জগত তৈরী করছিলেন গোপনে। শুভেন্দুর সান্নিধ্যে অনুকে বেশ সুখী স্বচ্ছন্দ মনে হত তাঁর। দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ রাগে নীরজার সারা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। বিছানায় উঠে বসে অনুর কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন, কী এমন ঘটল! শুভেন্দু তো ছেলে খারাপ নয়।

অনু নিশ্চুপ। স্থির চোখে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে।

— ওকে তোর পছন্দ হয় না? তাহলে এত গল্প করতিস কেন? কেন বারবার আসার কথা বলতিস?

— আঃ! কি হচ্ছে? অনু রাগত গলায় বলল, এটা তো সম্পূর্ণভাবে আমার ব্যাপার। একটু চুপ করে থেকে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, তোমার মতো আমারও তো একটা স্বপ্নের জগত তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু কী করব বল!

— কী করবি মানে? নীরজার বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না।

— তাই তো বলছি। অনু আস্তেভাবে হাসল, নির্মাণপর্বে প্রত্যেকেরই কিছু ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে।

নীরজা অনুর এ কথার অর্থ ধরতে পারলেন না। অনুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার ধৈর্যও রাখতে পারলেন না। আচমকা অনুর গালে সপাটে এক চড় মেরে হু হু করে কেঁদে ফেললেন, বাপ দাদুর মতো অহংকার। কী আছে তোর? আয়নায় নিজেকে একবার .... .!

নীরজার মুখের কথা কান্নায় ভেসে গেল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। অনু উঠে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, কাঁদছ কেন মা? কেঁদো না।

অনু নীরজার কাঁধে মাথা রেখে চুপ করে বসে রইল। তার দু চোখের আয়না জুড়ে বেপরোয়া শুভেন্দুর মুখ। হঠাৎ করে শুভেন্দু দুজনার মধ্যেকার দূরত্বটাকে এত ছোট করে আনতে চাইল কেন? অনুকে এতটা অসংযমী সুযোগসন্ধানী বলে মনেই বা হল কেন তার?

রাতের আঁধারে চারপাশ বড় চুপচাপ। মা মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসে। নীরজার যেমন একান্ত নিজস্ব সব কিছু বলতে অনুই, অনুরও নিজস্বতা বলতে আত্মসম্মানবোধটুকু। অথচ দুজনের কেউ-ই কাউকে মুখ ফুটে এসব কথা বলতে পারল না।

রাত গড়াচ্ছে রাতের নিয়মে। নতুন একটি ভোরের দিকে।